তোমার পরিবেশ

জনসংখ্যা শিক্ষা

মানব সম্পদ বিকাশের জন্য শিক্ষামূলক প্রকল্প

তোমার পরিবেশ

লেখক

শেখর মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা

বাণী ভৌমিক

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

পশ্চিমবঙ্গ

প্রকাশ
ডিসেম্বর □ ১৯৯৬

প্রকাশক
অধিকর্তা
জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকল্প
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ
পশ্চিমবঙ্গ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
অনুপম সেন

মুদ্রণ ও নির্দেশনা
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ
১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭২
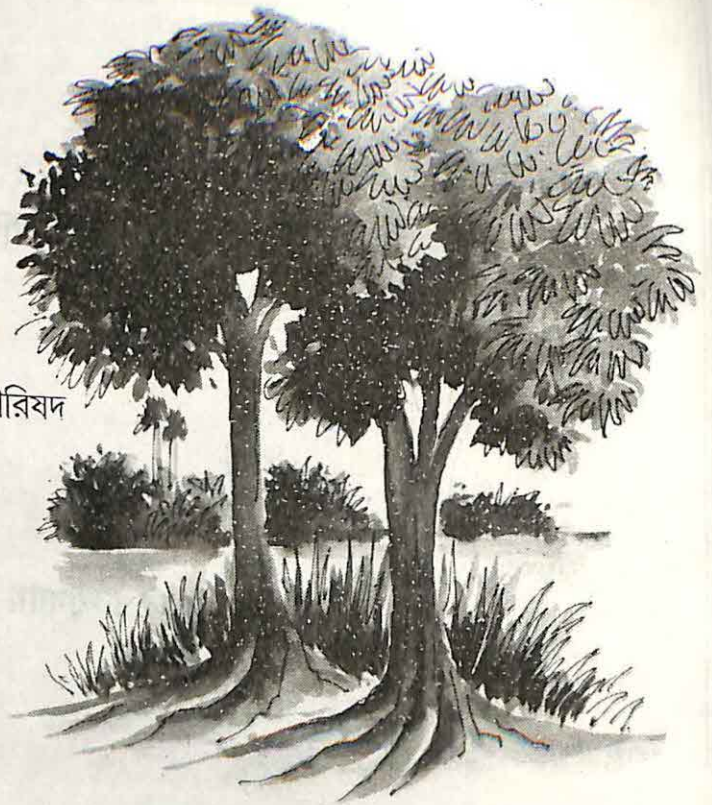
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ
২৫/৩, বালীগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা-১৯

ভূমিকা

"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ"-এর "জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকল্পের" পক্ষ থেকে মানব সম্পদ বিকাশের প্রেক্ষাপটে বিধিমুক্ত শিক্ষার পড়ুয়াদের শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসাকে সঠিক খাতে পরিচালিত করার জন্য এই স্বশিক্ষণ পুস্তিকা তৈরী করা হয়েছে।

সমাজের দুর্বল শ্রেণীর অবহেলিত কিশোর-কিশোরী যারা বিদ্যালয় শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের বিধিমুক্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে মানব সম্পদ বিকাশের লক্ষ্যে উপযুক্তভাবে অনুপ্রাণিত করার কাজে এই পুস্তিকাটি যদি অর্থবহ ও কার্যকরী হয় তবে এই প্রয়াস সার্থক বলে মনে করব।

অধিকর্তা
জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকল্প,
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ।
পশ্চিমবঙ্গ।

১১ই ডিসেম্বর, ১৯৯৬

বইটিতে যা যা পাবে

পরিবেশকে জানো

- পরিবেশ কাকে বলে
- পরিবেশের উপাদান
- প্রাণিজগত ও উদ্ভিদজগত
- প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রধান উপাদান
- তোমার পরিবেশ

পরিবেশের ক্ষতি

- প্রাকৃতিক উপাদান দূষণ
- জল দূষণ/মাটি দূষণ ও বায়ুদূষণ
- তোমার পরিবেশে এরা কিভাবে দূষিত হচ্ছে
- পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট

পরিবেশের ক্ষতিপূরণ

- জল দূষণ প্রতিরোধ
- বায়ু দূষণ প্রতিরোধ
- মাটি দূষণ প্রতিরোধ
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা
- পরিবেশ রক্ষায় তোমার কর্তব্য

পরিবেশকে জানো

পরিবেশ কাকে বলে

খুব সহজ কথায় বলতে গেলে—তুমি আর তোমার চারপাশে যা কিছু আছে তাই তোমার পরিবেশ।

এবার দেখ তো তোমার চারপাশে কি কি আছে। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলে বুঝতে পারবে তোমার চারপাশের সব জিনিসগুলোকেই দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। চারপাশেরযেসব জিনিসের প্রাণ আছে তাদের বলা হয় সজীব। আর চারপাশের যেসব জিনিসের প্রাণ নেই তাদের বলা হয় জড়।

তোমরাও এদের সহজে চিনতে পারবে।

পরিবেশের উপাদান

তোমার পরিবেশে আছে বাতাস, জল, মাটি, গাছপালা, পশুপাখী—এসব নানান্ জিনিস। এদের সবাই মিলেই গড়ে তোলে তোমার, আমার পরিবেশ। তুমি, আমি অন্য সবাই এই পরিবেশেরই অংশ। আমরা সবাই মিলে মিশে গড়ে তুলি আমাদের পরিবেশ। তাই এখানে সবারই দরকার অন্য সবাইকে।

এই পরিবেশের কেউই অন্যকে ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না।
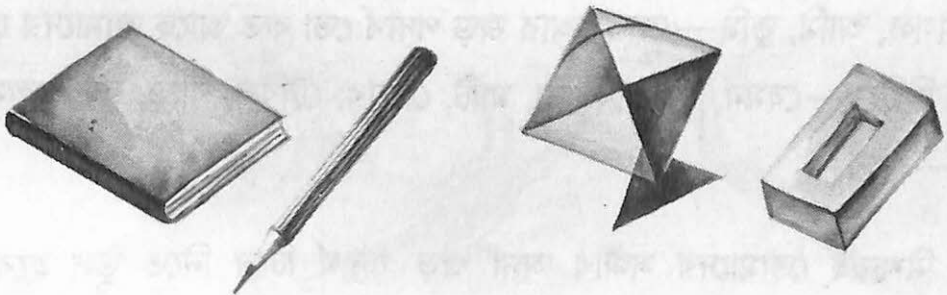
জড় পদার্থ

পরিবেশের প্রধান দুটো অংশ সজীব আর জড় পদার্থ। তোমার চারপাশের ছড়ানো জিনিসগুলোর মধ্যে কোনটা জড় আর কোনটা সজীব তা চিনবে কি ভাবে?

চেনা মোটেই কঠিন নয়, কেননা—

* যাদের প্রাণ আছে তারাই সজীব।
* সজীব জিনিসকে নাড়াচাড়া করলে বা আঘাত করলে তা সাড়া দেয়।
* সজীব জিনিস সময়ের সাথে সাথে আকারে বাড়তে থাকে।
* সজীব জিনিস বেঁচে থাকার জন্য খাবার বা খাদ্য খায়।
* সজীব জিনিস নিজেদের মতো আরও জীব তৈরি বা বংশবিস্তার করতে পারে।
* যে কোনও সজীব জিনিসের মৃত্যু আছে অর্থাৎ এক সময় এরা মরে যায়।

আর যে সব পদার্থের এসব গুণগুলো থাকে না তারা জড় পদার্থ।

সজীব পদার্থ হল গাছপালা, কেঁচো, শামুক, পিঁপড়ে, প্রজাপতি, টিকটিকি, মাছ, গরু, ছাগল, আমি, তুমি—এসব। আর জড় পদার্থ তো কত আছে আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে—যেমন, খাট, বিছানা, মাটি, চেয়ার, টেবিল, বাড়ি, বই, কলম, খাতা, জুতো—এসব।

এবার নিশ্চয়ই তোমাদের সজীব আর জড় পদার্থ চিনে নিতে ভুল হবে না।

প্রাণীজগত

পরিবেশের সজীব জিনিসগুলোকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একটা প্রাণী আর অন্যটা উদ্ভিদ বা গাছপালা, যে সব প্রাণীদের কথা আগে বলা হয়েছে তাদের মধ্যেও আছে নানা বৈচিত্র্য নানা ভাগ। এদের মধ্যে খালিচোখে দেখা যায় না এমন ছোট্ট প্রাণী আছে। আছে কেঁচো, শামুক, পোকামাকড়। জানলে অবাক হবে এসব প্রাণীদের মধ্যে কেউ কেউ আবার অন্য প্রাণীর দেহে বাস করে। এমন কি মানুষের দেহেও বসবাস করে। আমাদের তৈরি খাবার চুরি করে খায়। আমরা জানতেও পারি না তা। এদের বলে পরজীবী প্রাণী। এরা মানুষে বা অন্য প্রাণীদের রোগ সৃষ্টি করে। গোলকৃমি, কুঁচো কৃমি, যকৃৎ কৃমি এরকম পরজীবী। আমাদের পরিচিত বেশ কিছু রোগ যেমন আমাশা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, গোদ ইত্যাদি এসব পরজীবী প্রাণীদেরই সৃষ্টি।

প্রাণীদের মধ্যে যাদের কথা বলা হল এতক্ষণ তাদের দেহে কোন হাড়ের কাঠামো নেই। নেই শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড। তাই এদের অমেরুদণ্ডী প্রাণী বলে। আবার অনেক প্রাণী আছে যারা আকারেও খানিকটা বড় আর হাড়ের কাঠামো যুক্ত। এদের পিঠের ঠিক নীচেই থাকে হাড়ের মালায় তৈরি শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড। তাই এদের বলে মেরুদণ্ডী প্রাণী।
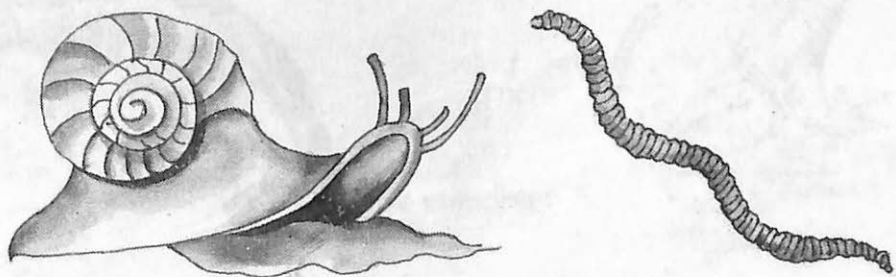
মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যেও আছে নানা রকমভেদ।

কোন কোন মেরুদণ্ডী প্রাণী জলে থাকে। ফুলকা নিয়ে শ্বাসকার্য্য চালায়। সারা গা থাকে আঁশে ঢাকা। আর জলের মধ্যে সাঁতার কাটার জন্য থাকে পাখনা আর লেজ। এরা হ'ল মাছ। আমাদের খুব চেনা মাছ। এদের মধ্যে আছে রুই, কাতলা, বাটা, তেলাপিয়া, খলসে ইত্যাদি মাছ, যারা মিষ্টি জলে থাকে। সাগরের নোনা জলেও থাকে অনেক মাছ যেমন-হাঙ্গর, শঙ্কর, করাত মাছ ইত্যাদি। কিছু মেরুদণ্ডী প্রাণীর

হাঙ্গর
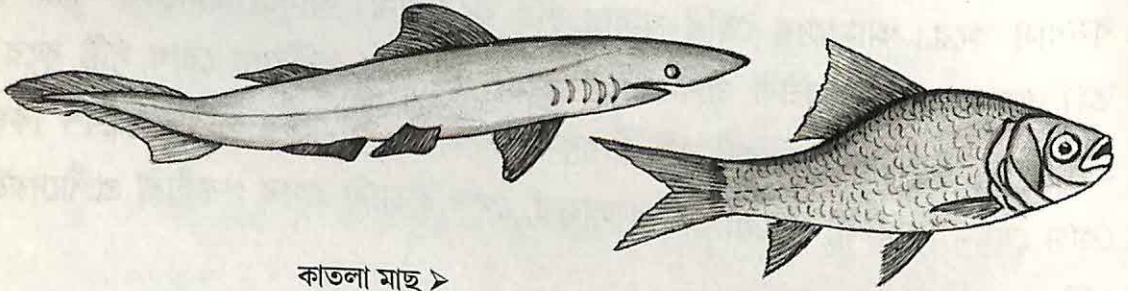
কাতলা মাছ

গায়ে কোন আঁশ বা লোম কিছুই থাকে না। এরা ভিজে স্যাঁতস্যাতে জায়গায় থাকে। ছোটবেলাটা কাটায় জলে। তখন ফুলকা দিয়ে শ্বাসকার্য চালায়। আবার বড় হয়ে ডাঙ্গায় থাকে তখন ফুসফুস দিয়ে শ্বাসকার্য চালায়, এমন কি গায়ের ভেজা চামড়া দিয়েও এরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চালায়। এদের মধ্যে আছে আমাদের চেনা নানা রকমের ব্যাঙ আর স্যালামান্ডার। এদের বলে উভচর প্রাণী। এরা মাছের থেকে উন্নত প্রাণী।

ব্যাঙ

স্যালামান্ডার
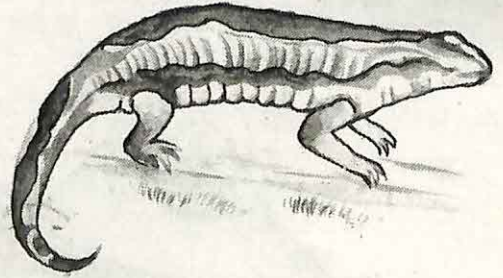
আরও কিছু মেরুদণ্ডী প্রাণী আছে যাদের সারা দেহ আঁশ বা বর্মে ঢাকা থাকে। *এরা বুকে ভর দিয়ে চলে। এদের আঁশ অবশ্য মাছের আঁশের থেকে আলাদা রকমের।* এরা সরীসৃপ। এদের মধ্যে আছে আমাদের চেনা প্রাণী—নানা রকমের সাপ, কচ্ছপ, কুমীর, টিকটিকি, গিরগিটি, গোসাপ ইত্যাদি প্রাণী।
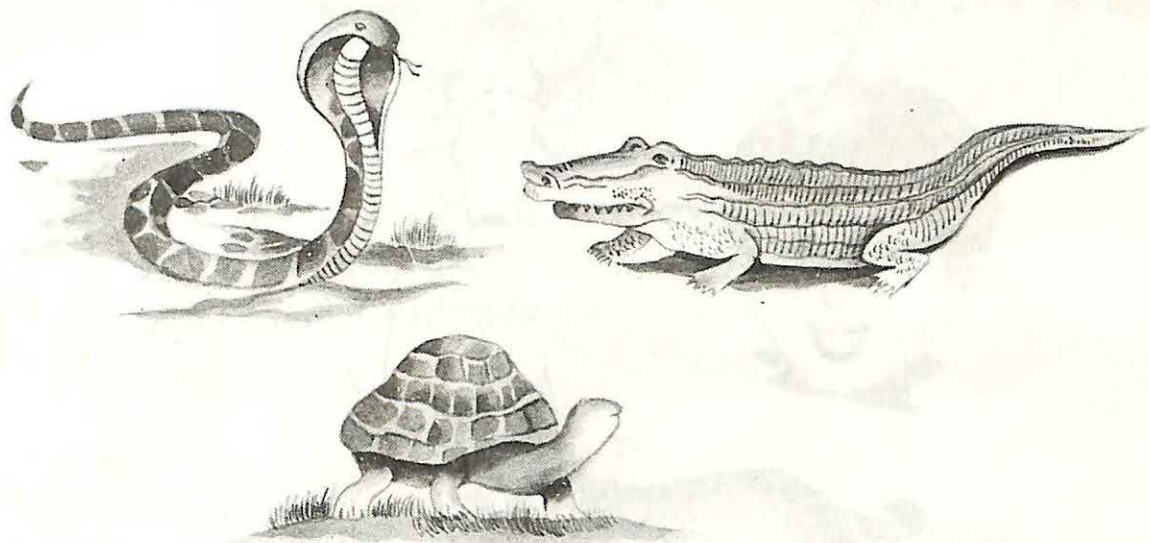
আরেক রকম মেরুদণ্ডী প্রাণী খুব চেনা আমাদের, তারা উড়তে পারে। একজোড়া ডানা আছে। ডানায় আর গায়ে থাকে পালক। মুখে থাকে শক্ত ঠোঁট। আর কিছু বলার দরকার নেই তো? চিনে ফেলেছো এদের? হ্যাঁ, এরা পাখী। আমাদের চারপাশে থাকা কাক, পায়রা, টিয়া, হাঁস, মুরগি এরা সবাই এই শ্রেণীর।
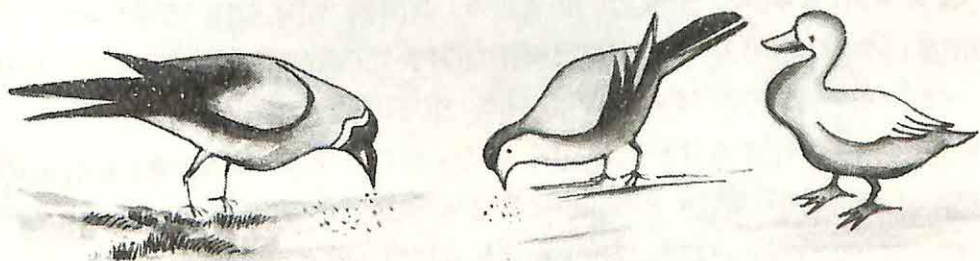
বাকী থাকলো আরেক দল মেরুদণ্ডী। এদের গায়ে থাকে লোম। মাথায় থাকে একজোড়া কান। আর এদের বাচ্চারা মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়। তাই এদের বলা হয় স্তন্যপায়ী প্রাণী। এদের মধ্যে আছে বাঘ, সিংহ, কুকুর, বিড়াল, বেজি, গরু, ছাগল ইত্যাদি আর তুমি-আমি অর্থাৎ মানুষ।

প্রাণীজগতের এসব খবরা-খবর জানার পর তোমাদের নিশ্চই চিনতে অসুবিধা হবে না এদের আলাদা আলাদা ভাবে।
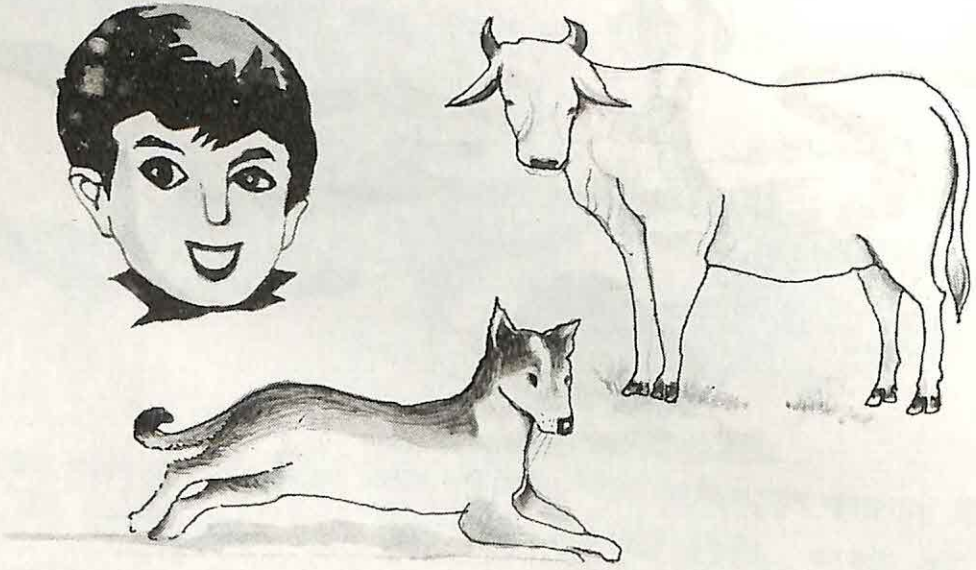
উদ্ভিদ জগত

এবার আরেক সজীব উপাদান উদ্ভিদ বা গাছপালার জগতটাকে একটু চিনে নেওয়া যাক্।

গাছপালার মধ্যেও এরকমই নানান রকমভেদ আছে। খালি চোখে দেখা যায়না এরকম সরু সূতোর মতো বা আলপিনের মাথার মতো গোল এমন গাছও পরিবেশে আছে, যেমন নানা রকমের শ্যাওলা বা ছত্রাক। আবার আম জাম বটের মতো বিশাল গাছও আছে। কিছু গাছের ফুল হয় না আবার অনেক গাছের ফুল ফোটে। ছত্রাক ও কয়েক ধরনের পরজীবী গাছ ছাড়া অন্য সবাই কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের নিজের খাবার তৈরী করতে পারে। গাছপালার জগতকেও নানা ভাবে ভাগ করা যেতে পারে। এখানে আমরা গাছপালার জগতকে খুব সহজ ভাবে চিনতে চেষ্টা করবো। আমরা গাছপালার জগতকে তাদের কাঠামো অনুযায়ী এভাবে সহজেই এই পাঁচটা ভাগে ভাগ করতে পারি।

ক মাটিতেই ছড়িয়ে থাকে। মাটি থেকে উঁচুতে উঠে দাঁড়াতে পারে না। যেমন, থানকুনি. আমরুল, শুষনি ইত্যাদি।
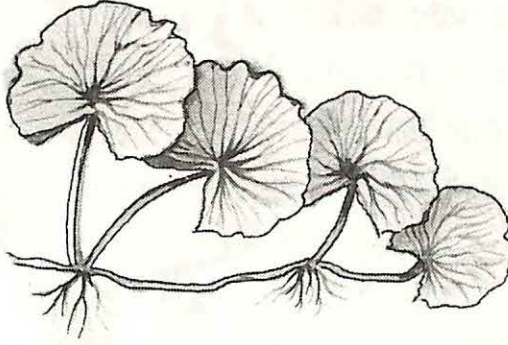
খ মাটির ওপর সোজা দাঁড়িয়ে থাকলেও এদের ডালপালা তেমন থাকেনা। খুব শক্ত নয় এদের কান্ড। ঝোপের মতো হয়। খুব বড় হয়না কখনও।
যেমন ঃ ধান, ঘাস ও নানারকম শাক।

গ মাটির ওপর শক্ত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ। ডালপালা থাকে, খুব মোটা গুঁড়ি হয়না। আমাদের মাথা ছাড়িয়ে বেশি উঁচুতে ওঠেনা। যেমন, জবা, গোলাপ, বেল ইত্যাদি ফুলগাছ।
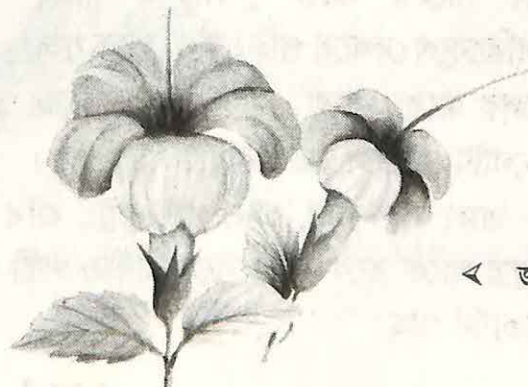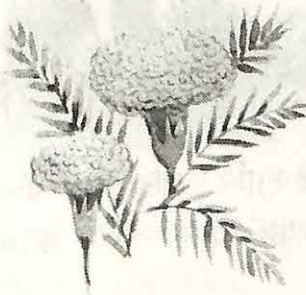
ঘ এরা মাটির ওপর শক্তভাবে দাঁড়াতেই পারে না। তাই অন্য কিছুকে জড়িয়ে ধরে এরা লতিয়ে ওঠে। যেমন ঃ মটর শুঁটি, পান, উচ্ছে ইত্যাদি গাছ।
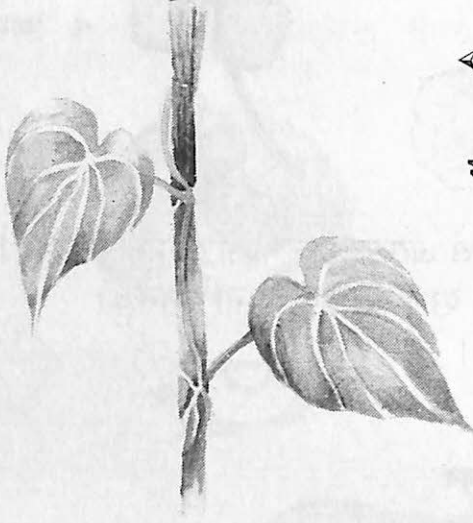
পান

মটর গাছ
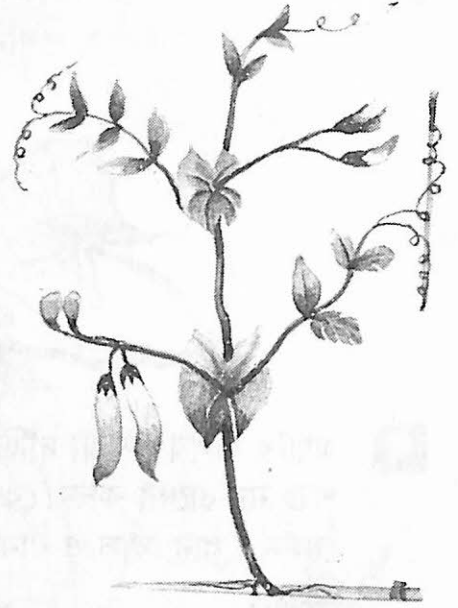
ঙ বড় গাছ। শক্ত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে মোটা গুঁড়ি আর ডালপালা থাকে। বহু বছর বাঁচে। মাটির নীচে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয় শেকড়। যেমন ঃ আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল ইত্যাদি।

আম গাছ

গাছের রকমভেদ নানা ধরনের হলেও ফুলফোটা গাছের মধ্যে দু'ধরনের গাছই আমরা পরিবেশে দেখতে পাই। ফুল থেকে ফল হয়। ফলের মধ্যে থাকে বীজ। সেই বীজ একটাই গোটা থাকলে হয় একবীজপত্রী গাছ। যেমন— তাল, নারকেল, ধান, গম, ভুট্টা, আঁখ ইত্যাদি। আর বীজ যদি দুটো আলাদা টুকরো হয়ে থাকে তবে তাকে বলে দ্বিবীজ পত্রী গাছ যেমন—আম, জাম, ছোলা, মটর, সরষে ইত্যাদি গাছ।

একটা মটর দানা ভিজিয়ে রেখে নরম করে চাপ দিলে তা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়। কিন্তু গম বা ভুট্টার দানা ভিজিয়ে রেখে কখনই তার থেকে দুটো অংশ পাওয়া যায় না। এছাড়াও খুব সহজভাবে এই একবীজপত্রী আর দ্বি-বীজপত্রী গাছ চেনা যায়। যে সব গাছের ডালপালা নেই—সাধারণতঃ তারা সবাই একবীজপত্রী গাছ। আর যেসব গাছের ডালপালা থাকে সেগুলো সবাই দ্বি-বীজপত্রী গাছ।

তোমার বাড়ির আশেপাশে এরকম দুধরনের গাছই দেখতে পাবে। যদিও পরিবেশে দ্বি-বীজপত্রী গাছের সংখ্যাই বেশী। দেখতো তুমি নিজে এই দুরকমের গাছ চিনতে পারো কিনা।
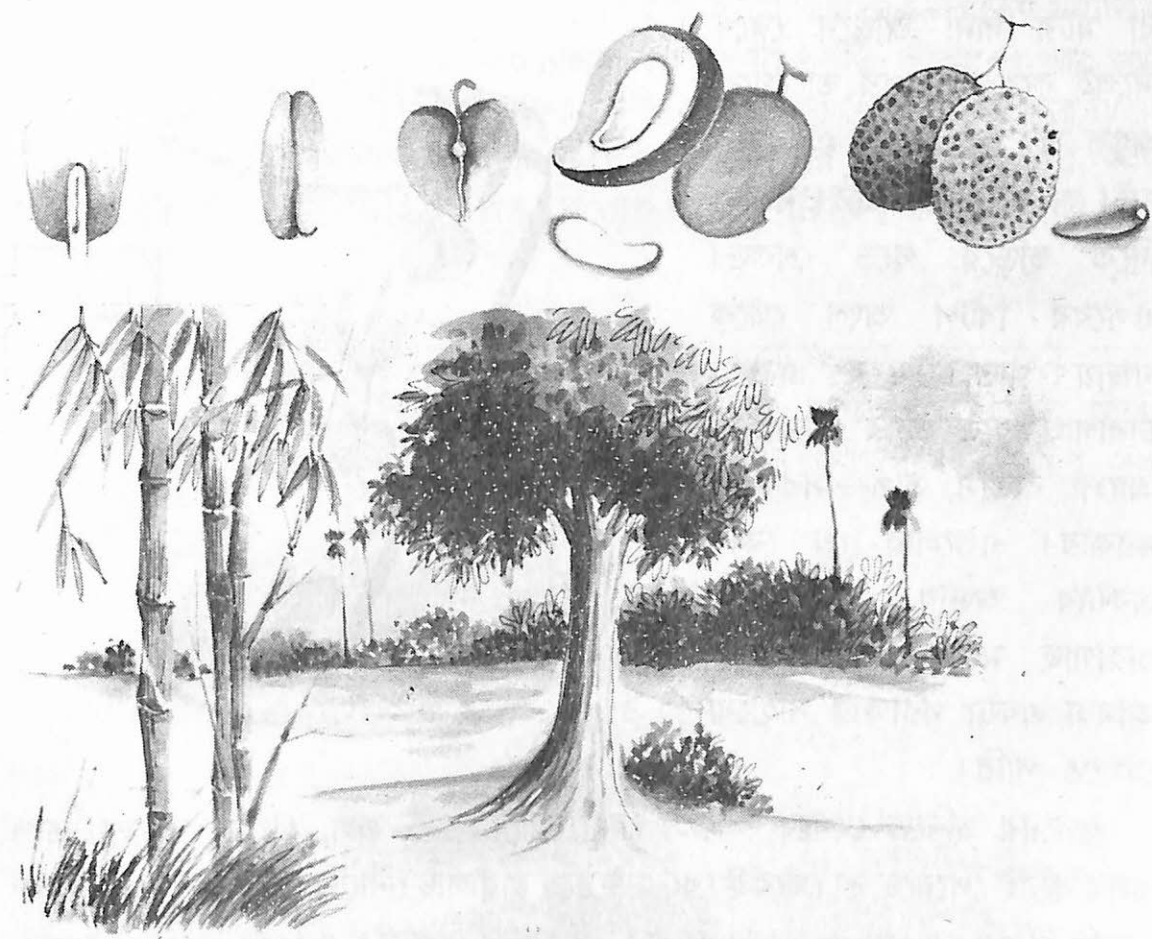
ওপরের ছবির গাছপালাগুলোর মধ্যে কোন কোনটি একবীজপত্রী আর কোন কোনটি দ্বিবীজপত্রী তা নিচে লিখে দাও।

ফলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটা বীজ থেকে কীভাবে একটা গাছ বেড়ে ওঠে তা ভালোভাবে দেখা যাক্।

বীজ থেকে চারাগাছ যখন একটু একটু করে বার হতে থাকে তখন তার ভীষণ দরকার হয়—জল, বাতাস, আলো, তাপ এসব জিনিস। আর এগুলো সবাই আমাদের পরিবেশে জড় পদার্থ। তাই জড় পদার্থের সাহায্য ছাড়া গাছ বাঁচতে পারে না। এমন কি কোন প্রাণী আর আমরা মানুষও জড় পদার্থের সাহায্যেই বেঁচে থাকি।

ছোলা বা মটর গাছের অঙ্কুরোদগম বা বীজ থেকে চারাগাছ জন্মানোর ব্যাপারটা সহজেই দেখতে পারি আমরা, জলে ভেজানো তুলো বা কাপড় দিয়ে কয়েকটা ছোলা বা মটর দানা জড়িয়ে রেখে দিলেই কয়েকদিন পর তা থেকে অঙ্কুর বার হয়। এবার ঐ অঙ্কুর দুটো অংশে বেড়ে ওঠে। নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে শেকড়। ওপরের বিটপ অংশ থেকে গজায় পাতা। তবে এভাবে চারাগাছ বেড়ে ওঠার জন্য জল, আলো, বাতাস, তাপ—সবকটাই দরকার। এগুলোর যে কোন একটার অভাব হলেই ঐ চারাগাছ মরে যাবে। এটাও আমরা একটা পরীক্ষার সাহায্যে দেখতে পারি।
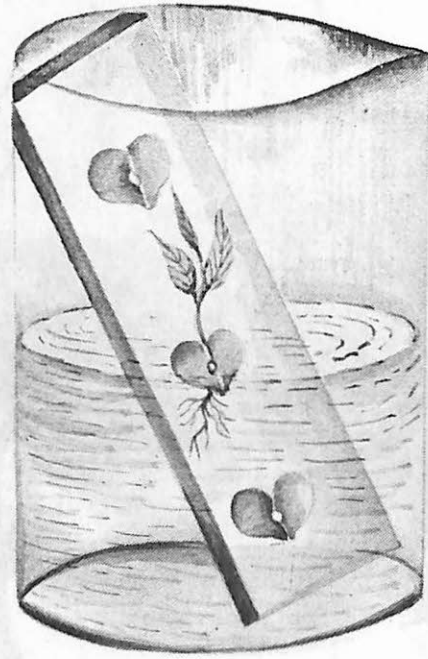
ওপরের ছবিতে দেখতে পাচ্ছো যে ছোলা বীজটি জল, হাওয়া, আলো, তাপ এসব কটাই পেয়েছে তা থেকেই বেড়ে উঠেছে চারাগাছ। নীচের ছোলাটি জল পেলেও পায়নি পর্যাপ্ত বাতাস ও তাপ। আবার একেবারে ওপরের ছোলাটি বাতাস, আলো, তাপ সবই পেয়েছে। পায়নি শুধু জল।

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রধান উপাদান

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে পরিবেশে যে কোন জীবের বেঁচে থাকার জন্য চাই জল, বাতাস, আলো আর তাপ। এগুলোই সবাই মিলে তৈরি করে পরিবেশের জলবায়ু। নানা ঋতুতে, নানা সময়ে, নানা জায়গায় বা দেশে জলবায়ু আলাদা ধরনের হয়। পুরো জলবায়ুকে নিয়মমতো চালনা করে সূর্য—সেই হ'ল প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রধান কর্তা।

আলো আর তাপ

সূর্যের দুটো হাত। আলো আর তাপ। এ দুই হাতেই সূর্য আমাদের জগতের সবরকম পরিবেশকে আগলে রাখে। নিয়মাফিক চালনা করে গোটা প্রকৃতি, জীবজগৎ আর জড় জগৎকে। সূর্যের আলোর তেজ ঋতুচক্রের আবর্তন ঘটায় অর্থাৎ নানা ঋতু ঘুরে ফিরে আসা যাওয়া করে। আমরা তাই আমাদের পরিবেশে পর পর দেখতে পাই গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এই ছয় ঋতু। প্রত্যেক ঋতুরই পরিবেশ অন্য রকমের।

জল

সূর্যের তাপে, নদী-নালা, সাগর থেকে জল একটু একটু করে উঠে যায়। আকাশের অনেক উঁচুতে গিয়ে তা মেঘে পরিণত হয়। মেঘ থেকে আবার নামে বর্ষা। সেই বর্ষার জলে বেঁচে থাকে গাছপালা আর প্রাণীজগৎ। পৃথিবীর সব
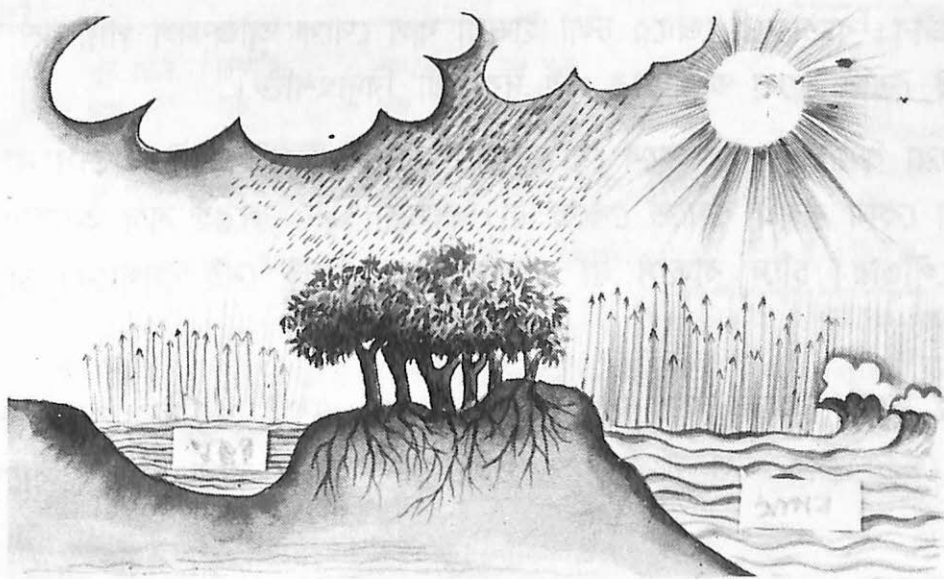
জলটাই এভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করে প্রকৃতি বা পরিবেশ। আর এই জল ছাড়া বাঁচেনা কোন সজীব কোষ বা সজীব পদার্থ। তাই তো জলের আরেক নাম জীবন।

বাতাস

বায়ু বা বাতাস আমাদের পরিবেশের আর এক প্রয়োজনীয় উপাদান। বাতাস ছাড়া গাছপালা বা প্রাণীজগৎ বেঁচে থাকতে পারে না। আমাদের এই পৃথিবীর চারদিকে ঘিরে রয়েছে বাতাসের এক পুরু চাদর। নানা রকম গ্যাস মিলেমিশে তৈরি হয়েছে বাতাস। বাতাসের ওজোন গ্যাসের এক চাদর আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে থাকে। এই চাদর ভেদ করে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি আমাদের পৃথিবীতে আসতে পারে না, ক্ষতি করতে পারে না প্রাণীজগতের। আবার বাতাসের মধ্যে থাকা অক্সিজেন আমাদের বেঁচে থাকার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এর অভাবে যে কোন জীবের মৃত্যু ঘটে। বাতাসে এই অক্সিজেনের পরিমাণ ঠিকঠাক রাখার জন্য আবার গাছপালার ভূমিকা অসাধারণ।

তাছাড়া বাতাসের গতিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ নানা উপকার পেয়ে থাকে। পালতোলা নৌকো, হাওয়া কল এসবই বাতাসের জোরে চলে। বাতাস না থাকলে উড়োজাহাজ উড়তে পারতো না। উড়তে পারতো না কোন পাখী, প্রজাপতি বা যে কোন জীব। বাতাসের জোরে চলা হাওয়া কল থেকে আজকাল পরিবেশ দূষণ না ঘটিয়েই তৈরি হচ্ছে আমাদের খুব দরকারী বিদ্যুৎশক্তি।

আরো শুনলে অবাক হবে যে তোমার চারপাশে থাকা এই বাতাস না থাকলে তোমরা কোন শব্দই শুনতে পেতে না। বাতাসে ভর করেই শব্দ আমাদের কানে এসে পৌঁছায়। চাঁদে বাতাস না থাকায় কোন শব্দই নেই সেখানে। চারিদিকেই নিস্তব্ধ।

তাই সূর্যের আলো আর তাপ, জল, বাতাস, এরাই প্রকৃতির প্রধান উপাদান। এরাই গোটা জীবজগত অর্থাৎ সব প্রাণী আর গাছপালাকে বাঁচিয়ে রাখে।

পরিবেশের সব উপাদান

সজীব আর প্রাণহীন তোমাদের আশেপাশের সব কিছুই তোমার পরিবেশ। পরিবেশে থাকা নানান জিনিসগুলো আমরা একটা ছকের সাহায্যে সহজেই চিনে নিতে পারবো। এরাই তোমার পরিবেশের নানান উপাদান।
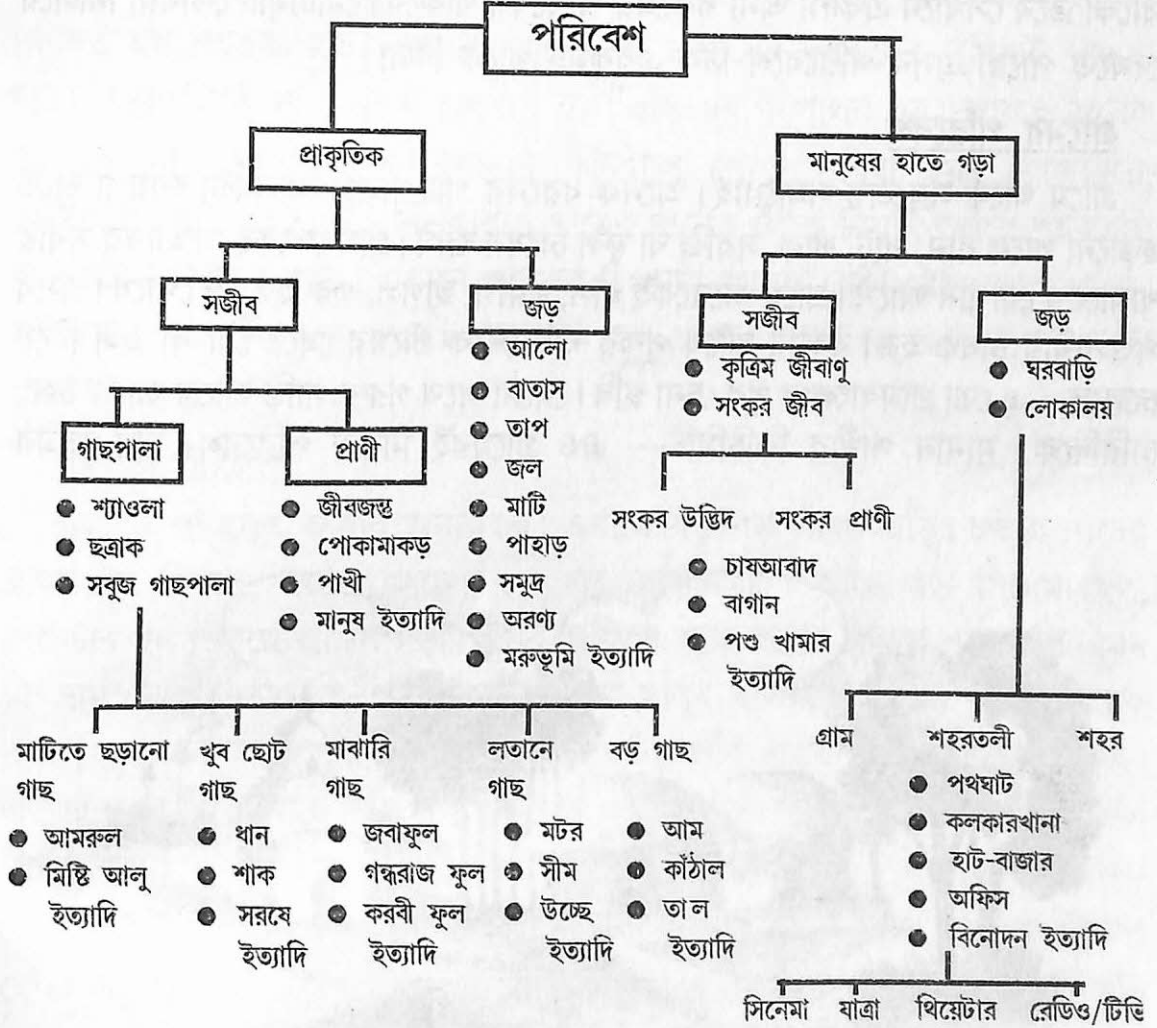
এসব জিনিস দিয়েই গড়ে ওঠে পরিবেশ। তাই পরিবেশ আছে নানা রকমের। প্রাকৃতিক পরিবেশ আর মানুষের হাতে গড়া নানান পরিবেশের সাথে তো তোমাদের পরিচয় আছেই। উপাদানের উপরই পরিবেশের নিজস্ব ধর্ম গড়ে ওঠে। এসব ছাড়াও আছে সামাজিক পরিবেশ।

তোমার পরিবেশ

নানা ধরনের পরিবেশের মধ্যে তোমার চারপাশে ঠিক কি ধরনের পরিবেশ গড়ে উঠেছে তা লক্ষ্য করেছো কি? তুমি যদি গ্রামে থাকো তবে একরকম পরিবেশ। আবার তুমি যদি শহরতলিতে থাকো তবে আরেক রকম পরিবেশ। আবার তুমি যদি শহরে থাকো তবে সেখানে একদম অন্য রকমের পরিবেশ থাকবে। মোটামুটি তোমরা মিলিয়ে দেখতে পারো এসব পরিবেশে ঠিক এরকমই থাকে কিনা।

গ্রামের পরিবেশ

গ্রামে থাকে সবুজের সমারোহ। অনেক ধরনের গাছপালা। অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়ানো থাকে ধান, পাট, শাক, সবজি বা ফুল চাষের জমি। গ্রাম থেকেই আমাদের সবার খাবারের যোগান আসে। গ্রামে অনেকেই হাঁস, মুরগি, ছাগল, গরু ইত্যাদি পোষে। এসব পশুপাখীর চাষও হয়। কলসী কাঁখে পুকুর ঘাট থেকে গ্রামের মেয়ে বৌ-রা জল নিয়ে চলেছে—এ তো গ্রামবাংলার খুব চেনা ছবি। মেঠো পথে গরুর গাড়ি আস্তে আস্তে চলা, চারিদিকে নানান পাখীর কিচিমিচি— এও গ্রামেরই নিজস্ব পরিবেশ। চাষ জমির

আলপথ ধরে দূরে কোথাও চলে যাওয়া গ্রামেই দেখা যায়। গ্রামে কলকারখানা বিশেষ নেই। তাই এখানে হাওয়া বিশুদ্ধ ও দূষণ মুক্ত। শহরের চারপাশে ঘিরে থাকে গ্রাম। শহরে খাবার দাবার, কাজের লোক, নির্মল হাওয়া—এসব যোগান দেয় গ্রাম।

শহরতলীর পরিবেশ

গ্রাম আর শহরের মাঝে থাকে শহরতলি। শহর ছড়িয়ে পড়ার জন্য অনেক গ্রামও পরিণত হয় শহরতলিতে। এখানে শহরের আর গ্রামের দুরকমের সুবিধাই পাওয়া যায়। শহরতলিতে নানা রকম চাষবাস হয়। হাঁস মুরগি পালন হয়। আবার অনেক কলকারখানাও থাকে। কলকারখানার কাঁচামাল পেতে সুবিধা হয়। রোজগারে, কেনাকাটা, ব্যবসা ইত্যাদি নানা কারণে গ্রামের অনেক লোক নিয়মিতভাবে শহরতলি বা শহরে যাতায়াত করে। এখানে শহরের তুলনায় অনেক বেশী গাছপালাও থাকে। হাটবাজার বসে নিয়মিত ভাবে। শহরতলি হল গ্রামের সাথে শহরের যোগাযোগের রাস্তা।

শহরের পরিবেশ

শহরের পরিবেশ আবার অন্যরকম। এখানে বড় বড় পাকা বাড়ি। চওড়া পিচের রাস্তাঘাট। বিশাল বাজার আছে। বড় বড় দোকানপাট। আছে বড় সিনেমা হল, থিয়েটার হল। আছে অফিসপাড়া। এসব অফিসে কাজ করার সুবাদে শহরতলি এমন কি গ্রাম থেকে এখানে প্রতিদিন নানা পেশার মানুষ যাতায়াত করে। শহরে অনেক রকম যানবাহন আছে। বাস গাড়ি, রিক্সা, অটো, লরি এসব চলে শহরের রাস্তায়। এছাড়া শহর ঘিরে আছে রেলগাড়ি চলার পথ। কলকাতা শহরে আরও আছে পাতাল রেল। শহরে অনেক কিছু দেখার জিনিসও আছে। অনেক দূর দূর থেকে মানুষজন সেসব দেখতে শহরে আসে। কলকাতা ও অন্যান্য বড় শহরে আছে অনেক আকাশ ছোঁয়া উঁচু বাড়ি। শহরের লোকজন বেড়েই চলেছে। এদিকে গাছগাছালির পরিমাণ অনেক কম। মানুষের ভিড়ে শহরের দমবন্ধ অবস্থা। তার উপর কলকারখানা অনেক। তাই শহরের পরিবেশ এখন নানাভাবে দূষিত বা নোংরা হয়ে পড়ছে। শহরের বাতাস, জল, মাটি এসবও দূষিত হয়ে যাচ্ছে। এই পরিবেশ দূষণের হাত থেকে শহরকে বাঁচাতেই হবে আমাদের।
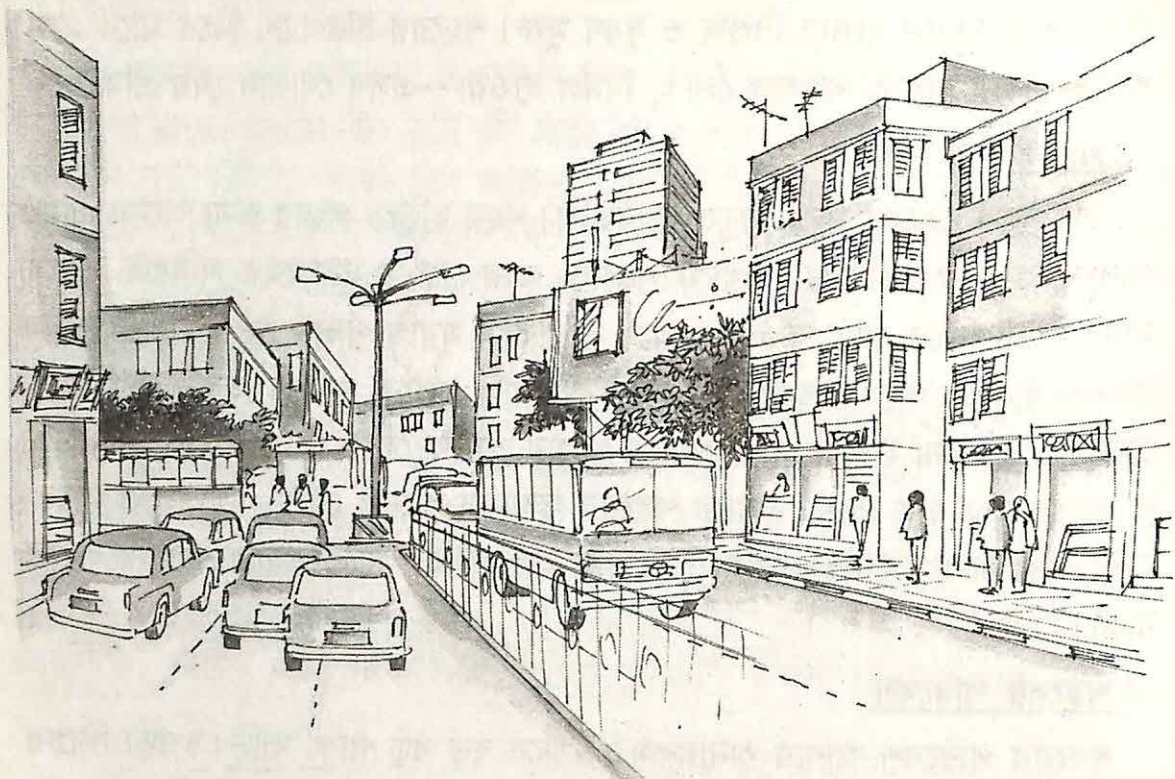
যে সব পরিবেশের কথা এখানে বলা হ'ল সেগুলো একদম ঠিকঠাক নাও মিলতে পারে। নানা দেশের নানা রকম আবহাওয়া, জলবায়ু, লোকসংস্কৃতি এসবের ওপরও নির্ভর করে পরিবেশ। তাই এমন কি আমাদের দেশেও নানা রাজ্যের গ্রাম, শহরতলি বা শহর আলাদা আলাদা রকমের। কিছু না কিছু তফাৎ তুমি পাবেই।

তাছাড়া দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধি আর বিজ্ঞান প্রযুক্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম, শহরতলী আর শহরের পরিবেশও খুব তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। তাতে সুবিধাও হচ্ছে, যেমন গ্রামেও আজকাল টেলিভিশন, টেলিফোন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি এসে গেছে। আবার অসুবিধাও কম নয়। যানবাহনের সাথে বাড়ছে বায়ুদূষণ, শিল্পের সঙ্গে বাড়ছে জলদূষণ আর মাটি দূষণ। গ্রাম পরিণত হচ্ছে শহরতলিতে আর শহরতলি হয়ে যাচ্ছে শহরেরই অংশ।

এছাড়াও পরিবেশের নানা রকমফের আছে। তোমার চারপাশে তার যে কোন একটা থাকবে।

<u>বাড়ির পরিবেশ</u>

যখন আমরা বাড়িতে থাকি তখন বাড়ির পরিবেশের মধ্যে থাকি আমরা। বাড়ির পরিবেশেও থাকে নানা সজীব আর জড় জিনিস। জড় জিনিসের মধ্যে আছে বাড়ি নিজেই। সে বাড়ি পাকাও হতে পারে আবার মাটির বা দরমারও হতে পারে। এছাড়া আছে নানা রকম আসবাব। চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারি, আলনা, বাক্স এসব। এবার সজীব পদার্থ কি কি থাকে দেখা যাক্। বাড়ির পোষা কুকুর, গরু, ছাগল, বেড়াল, হাঁস, মুরগী—এরাও পরিবেশের সজীব অংশ। বাড়িতে থাকে বেশী বয়সের লোকজন—দাদু, দিদিমা, ঠাকুমা, মা, বাবা, কাকা, এঁরা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও থাকে। সবাই মিলে গড়ে তোলে বাড়ির পরিবেশ।

বড়সড় বাড়িতে আবার বসার ঘরের পরিবেশ আলাদা। শোবার ঘরের পরিবেশ আবার রান্নাঘরের থেকে আলাদা। একই বাড়িতে তাই নানা ঘরে নানা রকম পরিবেশও পাওয়া যেতে পারে। তুমি যখন যে ঘরে থাকবে সেটাই তখন হবে তোমার পরিবেশ।
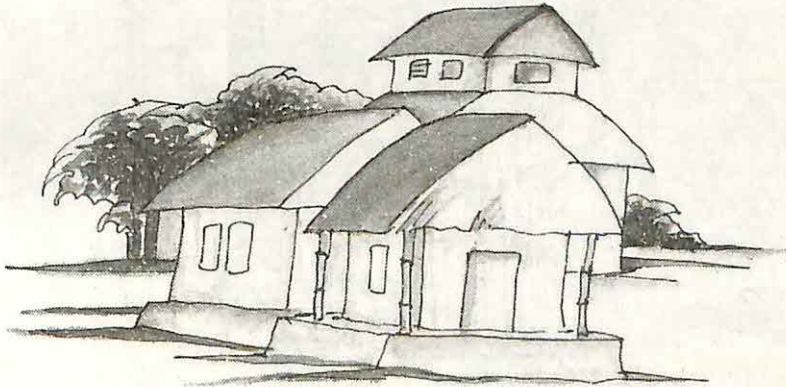
কাজের পরিবেশ

নানারকমের কাজের পরিবেশ হয়। যে যেমন ধরনের কাজ করেন তাঁর কাজের পরিবেশও তেমন। তুমি যদি কোন রকম কাজ করো বা মা-বাবার সঙ্গে সাহায্য করো তবে সেটাই তোমার কাজের পরিবেশ। বাবা, কাকারাও দেখবে নানা রকম কাজ করেন। কেউ কলকারখানায় কাজ করেন, কেউ অফিসে, কেউ বা আবার চাষবাসের কাজ করেন। শহরেও নানা রকম কাজের পরিবেশ হয়। কেউ ট্রাম, গাড়ি এসব চালায়, কেউ কাজ করে দোকানে। অনেকে হাসপাতালে কাজ করে। কেউ মাছ ধরে। কেউ বা খনিতে কাজ করে। এরকম হাজার রকম কাজের পরিবেশ হতে পারে।

পথঘাটের পরিবেশ

পথঘাটেও থাকে অন্য রকম একটা পরিবেশ। গ্রামের পরিবেশে পথঘাট হয় একরকম। সেখানে কাঁচা বা মেঠো পথ থাকে। থাকে আলপথ, বর্ষায় তাই গ্রামের পথঘাট খুব খারাপ হয়ে পড়ে। গ্রামের পথে, গরুর গাড়ি, রিক্সা, সাইকেল—এসব যানবাহনই বেশী চলে। শহরে পাকা পথ বা সড়ক থাকে। এসব পথে পথচারী ছাড়াও চলে নানা রকমের যানবাহন। চলে রিকসা, বাস, ট্রাম, গাড়ি, লরি এসব। শহরে মাটির নীচে চলে পাতাল রেল, সেখানে পরিবেশ একেবারেই অন্য রকম। ঝকঝকে পাতাল রেল আর তার তকতকে পরিবেশ এখনো আমাদের শহরের গর্ব।
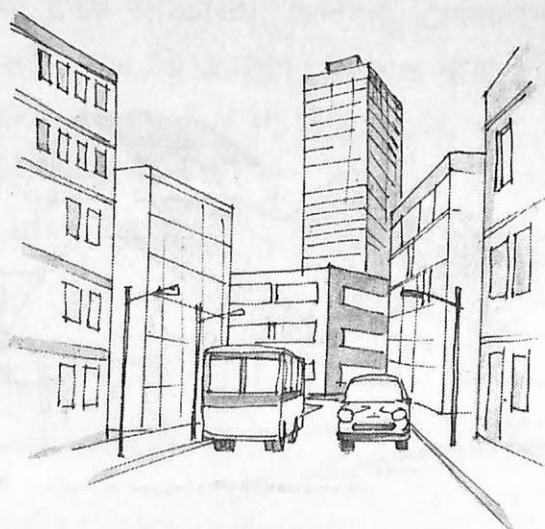
বিদ্যালয় বা কেন্দ্রের পরিবেশ

স্কুল বা কেন্দ্রের পরিবেশ একরকম। তোমার কেন্দ্রের পরিবেশে কি কি থাকে তা তো তুমি জানোই। সেখানে বসার জায়গা, বই, খাতা, কাগজ কলম, ব্লাকবোর্ড, চক এসব তো থাকেই। আরও থাকে সহপাঠী বা সহপাঠিনী। শেখানোর জন্য থাকে দিদিমণি বা মাস্টার মশাই। স্কুলে বা কেন্দ্রে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি, শিখতে পারি আলোচনা করতে পারি, জিজ্ঞাসা করতে পারি। ভালো আর মন্দের তফাৎ বুঝতে পারি। এমন কি আমাদের পরিবেশ চেনার জন্যও নানারকম পড়াশুনো করতে পারি।

হাটবাজারের পরিবেশ

পথের পাশেই গড়ে ওঠে নানা রকমের দোকানপাট, হাটবাজার। গ্রামের দোকানপাট আবার শহরের থেকে অন্য ধরনের। গ্রামের বাজারও বিশেষ রকমের। সেখানে তাজা শাক-সবজি, আনাজ পাওয়া যায়। সেখান থেকেই আবার তা শহরের বাজারে চালান হয়ে আসে। গ্রামে বিশেষ বিশেষ দিনে নির্দিষ্ট জায়গায় হাট বসে। গ্রামের হাট খুব বড় আর জমজমাট হয়। হাটে গ্রামের লোকেরা কেনাকাটার সঙ্গে সঙ্গে মেলামেশা আর নানা আলোচনাও করে।

শহরের দোকানপাট একটু অন্য ধরনের। এক এক রকম দোকানে এক এক রকম জিনিস বিক্রি হয়। শহরে খুব বড় বড় দোকানপাটও আছে। একসাথে নানা রকম দোকান মিলে বিরাট বিরাট দোকান বাড়িও থাকে শহরে। এসব জায়গায় একই বাড়িতে নানারকম জিনিসপত্র কিনতে পাওয়া যায়। শহরে হাট বসে না, শহরতলিতে অনেক সময় হাট বসে নিয়মিত ভাবে।

শহরের বাজারে নানা রকমের স্থানীয় এবং চালানী আনাজ, শাক-সবজি, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি পাওয়া যায়। বাজারের সাথেই থাকে নানা রকম মনোহারী আর মুদির দোকান। থাকে ওষুধ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্রের দোকান।
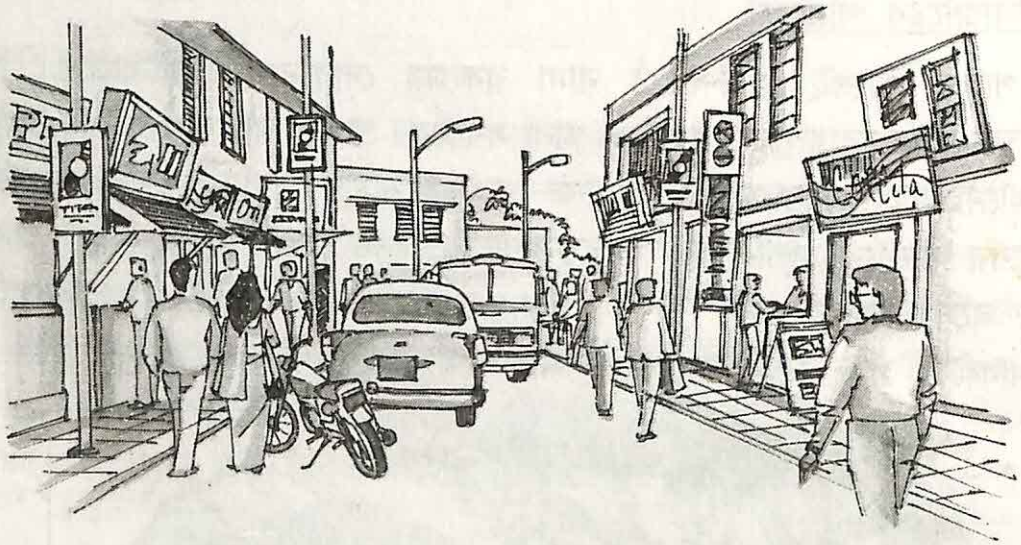
তাহলে দেখলে তো তোমার চারপাশে নানান ধরনের পরিবেশ ছড়িয়ে আছে। এসব মিলেই একটা বড় পরিবেশ গড়ে উঠেছে। এমন কি তোমার চারপাশের পরিবেশ সময়ের সাথে সাথে বদলে চলেছে। তবে সব রকম পরিবেশেই কিছু সজীব আর কিছু জড় উপাদান থাকবেই। তোমার খুব চেনা কিছু পরিবেশের কথা জানালাম। এসব তোমার পরিবেশের ছোট ছোট অংশ বা তোমার একেবারে কাছের পরিবেশ। এসব মিলেমিশে তৈরি হয় তোমার দেশের পরিবেশ। আরও বড় হল সারা পৃথিবীর বা জগতের পরিবেশ। সেখানে যোগ থাকে আবহাওয়া আর জলবায়ুর। পরিবেশের ওপর এদের বিরাট প্রভাব।

পরিবেশের ক্ষতি

আমরা তোমরা কেউই কিন্তু পরিবেশের প্রতি মোটেই যত্নশীল নই। ফলে আমাদের পরিবেশ ক্রমশই দূষিত হয়ে পড়ছে। আমরা অনেক সময়ই আবার আমাদের অজান্তেই পরিবেশের ক্ষতি করে চলেছি।

কত রকম ভাবে তুমি বা তোমার আশেপাশের লোকেরা পরিবেশের বিরাট এবং অপূরণীয় ক্ষতি করে চলেছো তা কি কখনও ভেবে দেখেছো?

তোমার পরিবেশের জল দূষিত হয়ে গিয়েছে। তোমার পায়ের নীচের মাটি হয়েছে দূষিত। তোমার চারদিকের বাতাস দূষিত আর বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে তা কি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে তা হয়তো তোমার কল্পনার বাইরে। এসো আমরা দেখি যে কতরকম ভাবে আমাদের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।

জলদূষণ

জলের আরেক নাম জীবন। জল ছাড়া বাঁচেনা কোন জীব। গাছপালা আর প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য আর বেড়ে ওঠার জন্য চাই বিশুদ্ধ জল। সেই জলই আজ দূষিত হয়ে পড়েছে।

তোমার চারপাশে জল দূষিত হয়ে পড়ছে। গোটা দেশের জলও আজ দূষিত এমন কি সারা পৃথিবীর বেশীরভাগ জলটাই তার বিশুদ্ধতা হারিয়ে ফেলেছে।

তোমার আশেপাশের পুকুর, নদী, নালা, বিল ইত্যাদি কিভাবে দূষিত হচ্ছে তা একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবে। পুকুরে নোংরা, আবর্জনা, সাবান জল, মলমূত্র ইত্যাদি ফেলা হচ্ছে। গবাদি পশুদের চান করানো হচ্ছে।
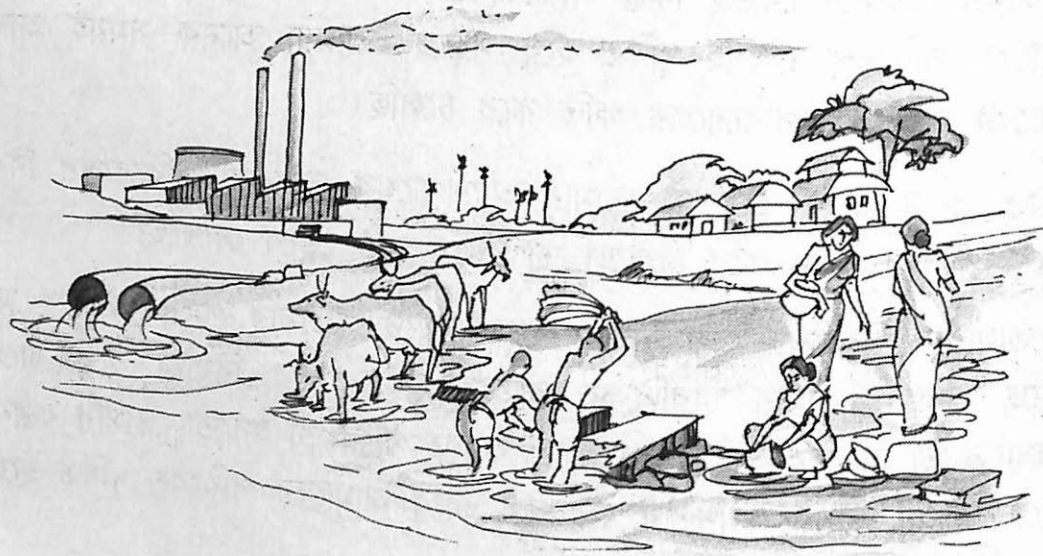
তারপরও সেই জল আর কিভাবে বিশুদ্ধ থাকবে? নদীতেও ফেলা হচ্ছে কলকারখানা থেকে আসা নানা বিষাক্ত রাসায়নিক, নানা আবর্জনা, নর্দমার জল ইত্যাদি। তোমরা জানলে অবাক হবে আমাদের 'পবিত্র' নদী গঙ্গা এখন দারুণভাবে দূষিত। নদীর দুপাড়ের অসংখ্য কলকারখানার বিষাক্ত আবর্জনা, রাসায়নিক, কৃষি আবর্জনা, কীটনাশক ওষুধ এমন কি অ্যাসিড্ প্রচুর পরিমাণে প্রতিদিনই নদীতেই এসে পড়ছে।

এমন কি সমুদ্রও রেহাই পায়নি। গোটা পৃথিবীতে মোট উৎপাদন খনিজ তেলের অধিকাংশই সমুদ্রপথে চালান যায়। এসব তেল বয়ে নিয়ে যাওয়া ট্যাঙ্কার বা তৈলবাহী জাহাজ থেকে নানা ভাবে সেই তেলের কিছু অংশ সমুদ্রে এসে পড়ে। শুধুমাত্র ভারতের চারপাশের সমুদ্রে প্রতিবছরে এভাবে প্রায় ১০,০০,০০০ টনেরও বেশি তেল ছড়িয়ে পড়ে। সমুদ্রের জলও হয়ে পড়ে দূষিত। বিষাক্ত তেল জমতে জমতে তা একসময় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়বে।

সমুদ্রের তলদেশ—বিশাল এক জায়গা, তাই আমরা সেখানে বানিয়েছি সবচাইতে বড় আস্তাকুঁড়। সেখানে আমাদের যত রকমের আবর্জনা, নোংরা, ময়লা সবই ঢালছি। এমন কি তেজস্ক্রিয় পারমাণবিক আবর্জনাও সেখানে খুসীমতো ফেলা হচ্ছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে আমরা ভারতীয় লোকেরা প্রতিদিন মাথাপিছু এক লিটার করে নোংরা আবর্জনা সমুদ্রে ফেলে থাকি।

নানা রকম বিষাক্ত কীটনাশক জলে ধুয়ে শেষ পর্যন্ত নদী হয়ে সেই সমুদ্রেই পৌঁছে যায়। সেখানে তা জমা হতে থাকে নানা সামুদ্রিক জীবের দেহে। যেসব বিষ সহজে নষ্ট হয় না। যেমন ডি ডি টি এবং এই জাতীয় কীটনাশক এখনো জমা হয়ে আছে সমুদ্রের জলে, মাটিতে ও নানান ধরনের জীবদেহে।

বায়দূষণ

আমাদের চারপাশে বেশ কয়েক মাইল জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে আছে বাতাসের এক পুরু চাদর। এই বাতাস মাটির কাছাকাছি বেশ ঘন। যতই ওপরের দিকে যাওয়া যায় ততই বাতাসের ঘনত্ব কমে যেতে থাকে।
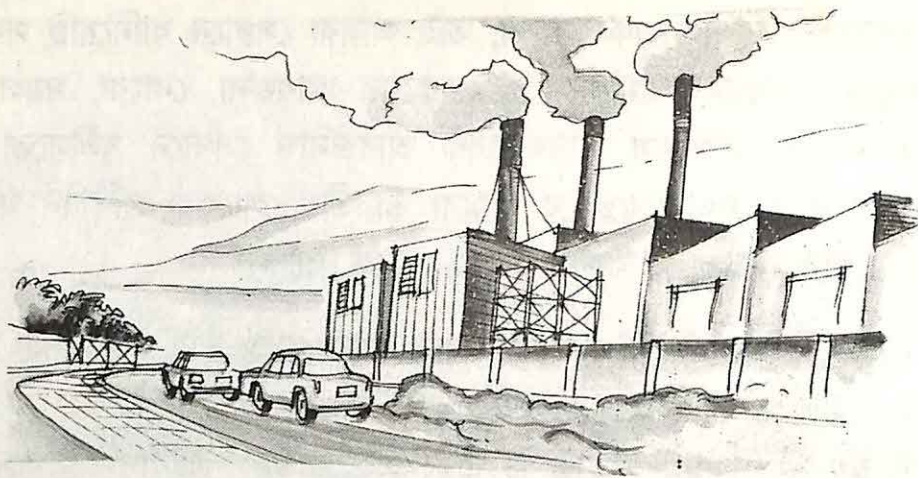
বাতাস সেখানে হালকা। এই বায়ুমণ্ডলে অনবরত আমরা বিযাক্ত গ্যাস, কলকারখানার ধোঁয়া, মটোর গাড়ির ধোঁয়া ছড়িয়ে দিচ্ছি। ফলে আমাদের জীবনদায়ী হাওয়া বা বাতাস হয়ে পড়েছে দূষিত।

বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে আমাদের ডাক্তারি বিদ্যা বা চিকিৎসা শাস্ত্রেরও অনেক উন্নতি ঘটেছে। ফলে এখন যতো লোক জন্মাচ্ছে, তার থেকে মরছে অনেক কম; তাই জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এতো লোককে খাদ্য, বস্ত্র, পানীয়, বাসস্থান ইত্যাদির যোগান দিতে শিল্প বাড়াতেই হবে। অনেক অনেক কলকারখানা বসাতে হবে। অনেক বেশী পরিমাণে চাযের জমি তৈরি করতে হবে। তাতে ছড়াতে হবে আরও বেশী কীটনাশক আর রাসায়নিক সার। অনেক বেশী তেল আর কয়লা পোড়াতে হবে। ফলে বায়ুমণ্ডলও আরো বেশী দূষিত হবে।

মানব সভ্যতার এক যুগান্তকারী ঘটনা প্রাচীন মানুযের আগুণের ব্যবহার শুরু। সেই থেকেই সম্ভবতঃ বায়ুদূযণ শুরু হয়েছে। তাই শিল্প আর কলকারখানা বেড়ে চলার সাথে কয়লা আর তেলও পোড়াতে হচ্ছে অনেক বেশী। পৃথিবীর বুকে জমে থাকা কয়লা আর তেলের প্রায় অর্ধেকটাই আমরা গত পঞ্চাশ বছরে পুড়িয়ে ফেলেছি। আর এই শিল্পায়ণের দ্রুতগতি যদি অব্যাহত থাকে তবে আগামী পঁচিশ তিরিশ বছরেই বাকী অর্ধেক তেল ও কয়লার ভাণ্ডার আমরা নিঃশেযিত করে ফেলবো।

আর সেই সঙ্গে দূষণের মাত্রা আমরা অনেক অনেক বাড়িয়ে তুলবো। তা ছাড়িয়ে যাবে বিপদসীমা। আমরা প্রত্যেকেই অসুস্থ হয়ে পড়বো। কেননা বাতাসে তখন অনেক বেড়ে যাবে 'কার্বন মনোক্সাইড', 'কার্বন ডাই-অক্সাইড', সিলভার অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, ও নাইট্রোজেন অক্সাইড ইত্যাদি বিপজ্জনক গ্যাস।

গাড়ি চালানোর জ্বালানী পেট্রোলে মেশানো হয় সীসা মাখানো রাসায়নিক। সীসা মানুষ ও পশু উভয়ের পক্ষেই বিপজ্জনক।

বায়ু দূষণের নানা উৎসের মধ্যে প্রথম সারির দোষীরা হলো শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, মোটর গাড়ি আর কলকারখানা।

শিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানান ধরনের নতুন নতুন রাসায়নিক ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। এদের বিষের কুফল আমরা এখনও হয়তো তেমন বুঝতে পারছি না। তবুও আমাদের অজান্তে এসব বিষাক্ত রাসায়নিক তার ছোবল হেনে চলেছে আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর। আমাদের নিত্য নতুন অসুখে ভুগতে হচ্ছে, এদের জন্যই।

জাতি সংঘের হিসেব অনুযায়ী আমাদের দেশের মুম্বাই শহরের বাতাসে সালফার ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বিপদসীমার অনেক ওপরে। আগামী ২০০০ সালে শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। দূষণের বহরটা তখন কি দাঁড়াবে ভাবো তো একবার?

মাটি দূষণ

মাটিতেই জন্মায় খাদ্যশস্য। মাটিতে জন্মায় সব গাছপালা। সে কারণে মাটি দূষিত হয়ে গেলে আমাদের খাবারের ভাড়ারে পড়বে টান। অথচ না জেনেই মাটিতে আমরা জমিয়ে তুলছি জঞ্জালের পাহাড়। মাটিতে মিশছে কতশত কীটনাশকের বিষ। মাটিতেই জমা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সারের উচ্ছিষ্ট। মাটিকে মোটেই যত্ন করি না আমরা।

তোমরা জানলে অবাক হয়ে যাবে যে পৃথিবীর সব মানুষ মিলে বছরে প্রায় একশো কোটি টন জঞ্জাল বা আবর্জনা ফেলে আমাদের পরিবেশে। এসব জঞ্জালের মধ্যে থাকা জৈব পদার্থগুলো মাটিতে থাকা হরেক জীবাণু, কৃমি, কীটের দ্বারা আবার মাটিতে মিশে যাবে। তবে মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে জঞ্জালের মধ্যে অনেকটা পরিমাণেই থাকছে— প্লাস্টিক, পলিথিন, রবার, কাঁচ, নাইলন, ধাতু ইত্যাদি। এসব মাটিতে কখনই মিশে যায় না। এটাই বিপদের কারণ, কেননা মাটিতে এগুলো বছরের পর বছর ধরে জমা হতে হতে এক সময় মাটির নিজস্ব ধর্মই নষ্ট হয়ে যায়। পুরোপুরি তার উর্বরতা হারিয়ে ফেলে মাটি। আর মাটি নষ্ট হয়ে গেলে আমরা চাষ করবো কোথায়? খাবো কি? বুঝতেই পারছো সেই ভয়ংকর অবস্থাটা?

তার ওপর আছে মাটিকে অতিরিক্ত ভাবে ব্যবহার করার বিপদ। লোকসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য আমরা জমিতে বার বার চাষ করছি। সেখানে ঢেলে চলেছি নানা রকম রাসায়নিক সার প্রচুর পরিমাণে। এতে কিছুদিন আমাদের ফসলের বাড়বাড়ন্ত থাকবে ঠিকই—কিন্তু তারপর? তারপর মাটি অতিরিক্ত ব্যবহারে রিক্ত হয়ে পড়বে। উর্বরতা কমে যাবে ধীরে ধীরে। প্রাকৃতিক উর্বরতা ফিরে আসবেনা আর। তাছাড়া এখন মাটিতে প্রচুর পরিমাণে ঘনীভূত নাইট্রেট সার ব্যবহার করা হচ্ছে। এরা হয়তো আরোও বিশ পঁচিশ বছর পর চলে আসবে আমাদের পানীয় জলে। কমজোরী করে দেবে ছোটদের রক্তের অক্সিজেন বহন ক্ষমতাকে।

এছাড়া কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহারও মাটিকে বিষাক্ত করে তুলেছে। প্রয়োজনের থেকেও বেশী পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহার করছি আমরা। ডি ডি টির মতো অনেক কীটনাশকের বিষ বহু বহু বছর ধরে জমে থাকে মাটিতে। ক্ষতিকর পোকামাকড়ের সাথে ধ্বংস হয় আমাদের একান্ত উপকারী অনেক অনেক জীবাণু, কেঁচো, কৃমি ও পোকামাকড়। মাটি তাই দূষিত হয়ে পড়ে।

কলকারখানা থেকে নানা রকম বিষাক্ত রাসায়নিক মাটিতে পুঁতে ফেলা হয় নিয়মিত ভাবে। কারখানার এসব বিষ মাটিতে জমতে থাকে দীর্ঘদিন ধরে। মাটি হয়ে পড়ে বিষাক্ত, দূষিত। এমনকি পারমাণবিক তেজস্ক্রিয় জঞ্জালও মাটিতেই পুঁতে রাখা হয়। মাটির ওপর এসব অত্যাচার চললে মাটির দশা কি হবে তোমরা তা বুঝতে পারছো তো?

তোমার নিজের পরিবেশে এরা কিভাবে দূষিত হচ্ছে
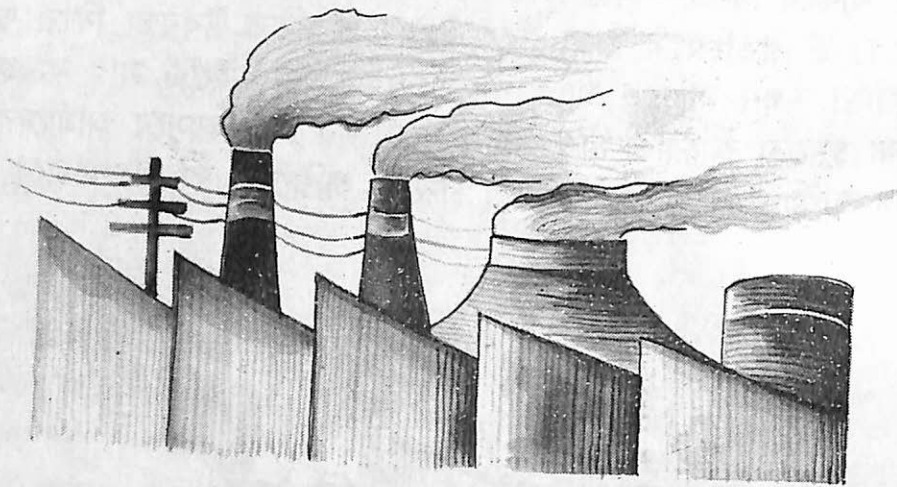
তুমি তোমার আশেপাশে নজর রাখো, দেখবে যে পরিবেশের এই প্রধান উপাদানগুলো কিভাবে দূষিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই অবশ্য আমরা বা তোমরা না জেনে বুঝে এসব দূষণ ঘটাই।

তুমি যদি গ্রামে বা শহরতলী এলাকায় থাকো তবে দেখবে যে সেখানে পুকুরের জল ব্যবহার করে সবাই কিন্তু তা কিভাবে পরিষ্কার রাখা যায় সে ভাবনা নেই কারো। সেখানে নর্দমার জল পড়ছে, কাচাকুচি হচ্ছে, গরু মোষ স্নান করানো হচ্ছে এমন কি খাটাপায়খানা বা বাথরুমের জলও সেখানে পড়ছে। মাটিতে জঞ্জাল যেখান সেখানে ফেলা হচ্ছে, আবর্জনার পাহাড় দিয়ে ভরাট করা হচ্ছে ডোবা, নালা বা পুকুর। চাযের জমির প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক মেশানো বা রাসায়নিক সারের উচ্ছিষ্ট মেশানো জল এসে পড়ছে নদীতে। নদীতে পলি বা আবর্জনা হয়ে জলের স্রোত কমে যাচ্ছে। নদীতে তখন জন্মাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে শ্যাওলা আর ঝাঁঝি। মাছ কমে যাচ্ছে অসম্ভব দ্রুত গতিতে।

শুধু তাই নয় গ্রামের বা শহরতলীর ছোট-খাটো কারখানা, ইঁটভাটা, টালিখোলা ইত্যাদি থেকে বাতাসে মিশছে ধোঁয়া আর ধূলোকনা এমনকি বিষাক্ত রাসায়নিক।

তুমি যদি শহরের মধ্যে বাস করো তবে দূষণ তোমার পিছু ছাড়বে না মোটেই। বরং আরো বেশী মাত্রার দূষণের মুখে পড়বে তুমি। তুমি চারপাশেই খেয়াল করে দেখ।

দেখবে শহরের প্রান্ত ঘেঁসে বয়ে যাওয়া নদী আজ কি ভয়ংকর দূষিত, সে নদীর জল পানের অযোগ্য। সেখানে মাছ তেমন আসে না। নদীতে চড়া পড়ে নদী তার নাব্যতা হারিয়েছে। এসব কেন হয়েছে জানো। আমাদের জন্যই। আমরা শহরের সমস্ত দূষিত জল, নোংরা জল, নর্দমার জল অনবরত ঢেলে দিচ্ছি নদীতে। নদীর পাড়ের কলকারখানা থেকে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে বিষাক্ত রাসায়নিক, অ্যাসিড, ময়লা, আবর্জনা ইত্যাদিও নিয়মিত ভাবে ফেলা হচ্ছে নদীতে। পুকুর তো শহরে প্রায় নেই বললেই চলে। পুকুর ভরাট করে সেখানে ঘড়বাড়ি তোলার প্রতিযোগিতা চলছে অনেক দিন ধরেই। শহর ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়ার ফলে গাছপালার সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। শহরের হাওয়া কলকারখানা আর অসংখ্য বাস, লরী, অটো আর মোটর গাড়ির দৌলতে ভীষণ দূষিত হয়ে পড়েছে। নানা কারখানা থেকে গ্যাসবাস্প আর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির ধূলো আর ধোঁয়া ব্যাপারটাকে আরও বিষিয়ে তুলেছে। তোমাদের চোখের সামনেই এসব সর্বনাশ ঘটে চলেছে। এটা আটকানো দরকার।
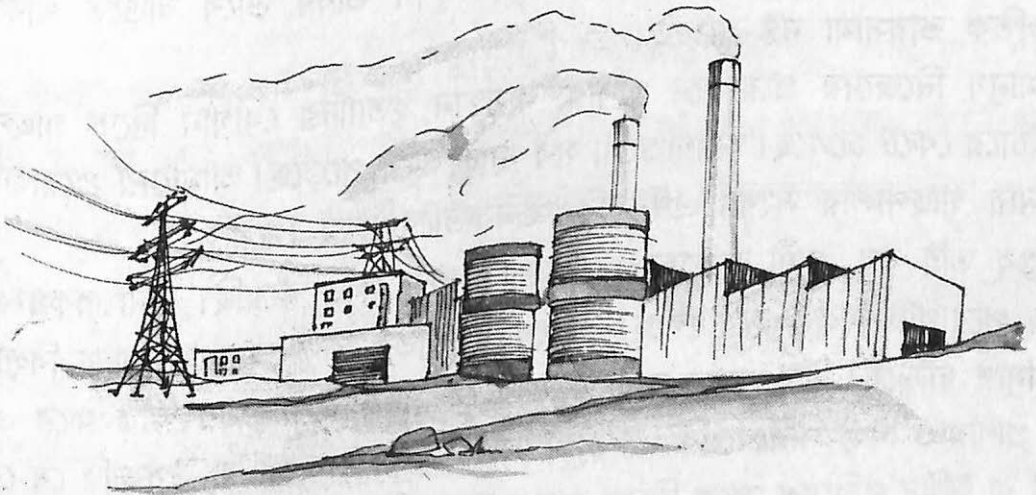
পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট
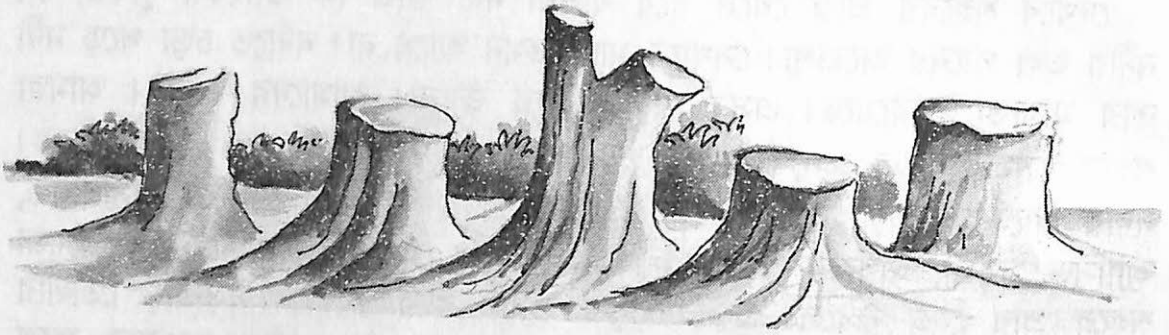
আমাদের পরিবেশের সবকটি উপাদান প্রকৃতি এমন ভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন যে আমাদের পরিবেশ সর্বদাই নির্মল ও সুস্থ থাকে। একটা নিখুঁত ভারসাম্যের ব্যবস্থা প্রকৃতিতে বরাবরই থাকে। তাই গাছপালা আর পশুপাখী একে অপরের সাহায্যে বেঁচে থাকে। জীবজগত আর জরজগতও একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক সব উপাদানই জীবজগতকে বেঁচে থাকার রসদ জুগিয়ে চলে। কেউ কারো ক্ষতি করে না।

কিন্তু মানুষ তার ক্রমাগত বেড়ে যাওয়া জনসংখ্যার চাপে বাধ্য হয়েই প্রাকৃতিক এই ভারসাম্য নষ্ট করেছে। অনেক সময় নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্যও অজান্তে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ক্ষতি করেছে মানুষ। দূষণ ভীষণ ভাবে বাড়তে থাকায়ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে।

মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে খাবার, বাসস্থান ইত্যাদির যোগান দিতে গাছপালা নির্বিচারে কেটে চলেছে। অরণ্যগুলো সব ন্যাড়া হয়ে পড়েছে। আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় গাছপালার সংখ্যা এখন বিপজ্জনকভাবে কমে গিয়েছে।

শুধু তাই নয়, প্রাণী জগতেরও আমরা অনেক ক্ষতি করেছি। নানা রকম প্রাণী আজ পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অসংখ্য প্রজাতির প্রাণী আর গাছপালা বিলুপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এটা জেনে রাখা দরকার যে সরাসরি মানুষের ক্ষতি করে এমন সব প্রাণীরাও কিন্তু পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই ক্ষতিকর বা উপকারি যে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ পরিবেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে।

পরিবেশের ভারসাম্য এরকম নানা ভাবেই নষ্ট হতে পারে। পরিবেশের প্রধান প্রাকৃতিক উপাদানগুলির দূষণ অর্থাৎ জল, বাতাস, মাটি এসব দূষিত হওয়া। তাছাড়া নির্বিচারে বনজঙ্গল কেটে সাফ্ করে দেওয়া। নানারকম পশুপাখী আর গাছপালাকে চিরতরে বিলুপ্ত করে দেওয়া—এসবই দারুণভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে, তবে এই দশকের সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার বলে বিজ্ঞানীরা যেটিকে চিহ্নিত করেছেন তা হলো "ওজোন স্তরের ক্ষতি"।

আমাদের এই গোলাকার পৃথিবীকে ঘিরে চারপাশে কয়েক মাইল পুরু বর্ণহীন এক গ্যাসের চাদর জড়ানো আছে। মাটি থেকে প্রায় বিশ পচিশ মাইল ওপরে এই স্তরের দেখা মেলে। এটিরই নাম ওজোন স্তর। এটি সারা পৃথিবীর জীবকূলের জন্য এক রক্ষাকবজ হিসাবে কাজ করে। সূর্যের আলোর ক্ষতিকর অতি বেগুনী রশ্মি ওজোন স্তর ভেদ করে পৃথিবীতে সহজে পৌঁছতে পারে না। অতিবেগুনী রশ্মির প্রায় পুরোটাই এই ওজোন স্তর শুষে নেয়। সামান্য কিছুটা আমাদের কাছে পৌঁছায়। ওজোন স্তর না থাকলে প্রাণীদের নানা রোগ এমন কি চামড়ার ক্যানসারও হতে পারে।

এছাড়াও ওজোন স্তর নষ্ট হলে আমাদের স্বাভাবিক জলবায়ুও নষ্ট হয়ে যাবে। সূর্যের আলো আর তাপ পৃথিবীতে ঢুকবে। কিন্তু পৃথিবীর তাপকে বাইরে যেতে দেবে না। এভাবে চললে পৃথিবী একটা বিরাট সবুজ কাঁচঘরের মতো গ্রীণ হাউসে পরিণত হবে।

জল ও মাটি দূষিত বা বিষাক্ত হয়ে গেলে সেখানে থাকা নানা রকম প্রাণী বা উদ্ভিদ ধ্বংস হয়ে যাবে। এমন কি জলে বা মাটিতে থাকা নানারকম জীবাণুও শেষ হয়ে যাবে। পরিবেশের হবে বিরাট ক্ষতি। এভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে আমাদেরও কিন্তু নিস্তার নেই। তাই পরিবেশের ভারসাম্য যাতে কোন ভাবেই নষ্ট না হয় সেদিকে রাখতে হবে সজাগ দৃষ্টি।
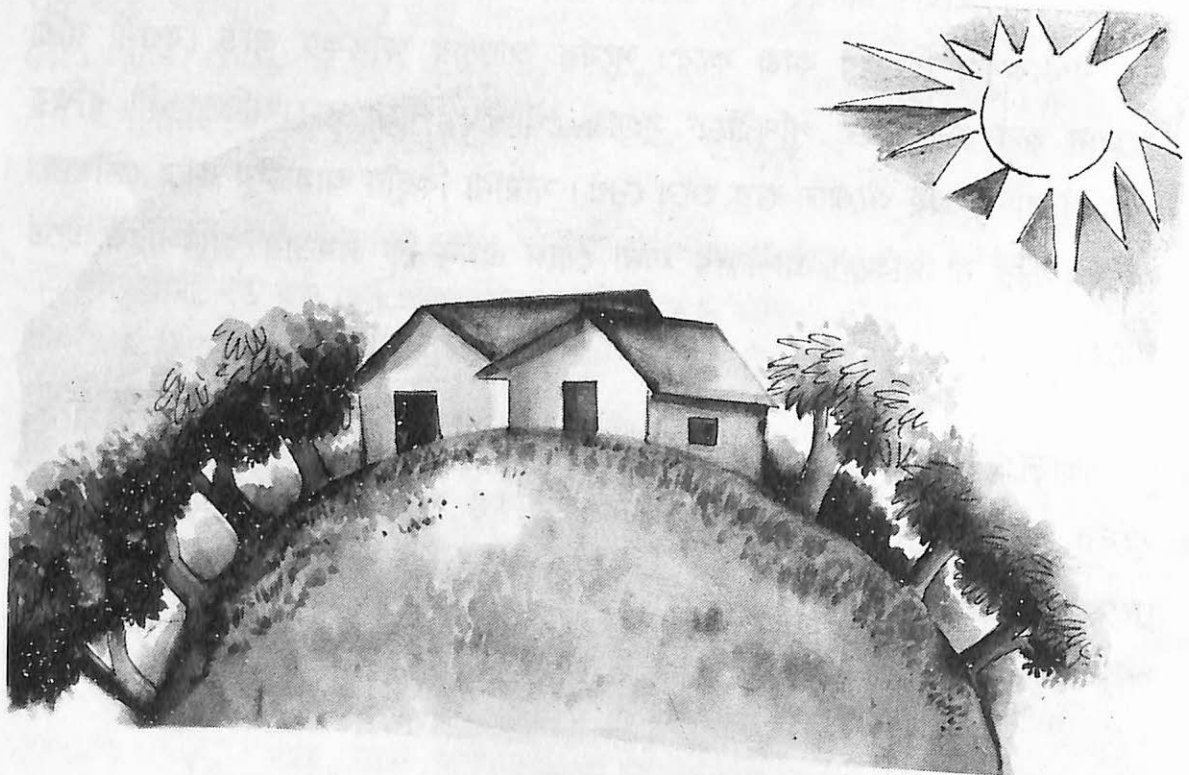
ওজোন স্তরের চাঁদোয়া পৃথিবীকে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে আগলে রাখে।

খুব গরম হয়ে যাবে পৃথিবী। মেরু এলাকার সব বরফ গলে যাবে। সমুদ্রে জল বেড়ে অনেক দেশ ডুবে যাবে। সব জায়গায় জলবায়ু ওলটপালট হয়ে যাবে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ওজোন স্তরের বিলুপ্তি মানে যেন প্রাণেরই বিলুপ্তি।

এবার দেখা যাক লাজুক স্বভাবের এই গ্যাসের স্তরটিকে কিভাবে আমরা নষ্ট করছি, ফুটো করছি বা পাতলা করে ফেলছি।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নতুন আবিষ্কার মানুষের উপকারে লাগছে—একথাও যেমন ঠিক, তেমনই এসব আবিষ্কারই অনেক সময় ডেকে আনছে দারুণ বিপদ।

এক দেশ থেকে অন্য দেশে দ্রুত যাতায়াতের জন্য শব্দের থেকেও বেশী গতিবেগের উড়োজাহাজ থেকে বেরোয় নাইট্রোজেন-অক্সাইডের মিশ্রণ যার মধ্যে থাকে ওজোন স্তরের পরম শত্রু নাইট্রিক-অক্সাইড।

বায়ুমণ্ডলে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পরীক্ষা চালালেও বাতাসে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন অক্সাইড মেশে। এটাও ওজোন স্তরের দারুণ শত্রু।

তাছাড়া 'এয়ারোসোল বা বিভিন্ন সেন্ট, লোশন, ওষুধ ইত্যাদি স্প্রে করার সময়ও 'ক্লোরো-ফ্লুরো-কার্বন' বা সি এফ সি জাতীয় গ্যাস বাতাসে মেশে যা এই ওজোন স্তরকে আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

এছাড়াও প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্য আমরা নষ্ট করে দিচ্ছি বেহিসাবী জ্বালানী পুড়িয়ে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বাড়িয়ে, বাতাসে নানাভাবে সালফার ডাই-অক্সাইড আর নাইট্রিক অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছি ফলে তা থেকে পৃথিবীতে ঝড়ে পড়ছে সালফিউরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিড। জলের সঙ্গে মিশে তা তৈরি করছে 'অ্যাসিড বৃষ্টি'—যা সমস্ত জীবের পক্ষেই দারুণ ক্ষতিকর।

পরিবেশের ক্ষতিপূরণ

পরিবেশের মৌলিক উপাদানগুলো আমরা নানাভাবেই নষ্ট করে চলেছি বা দূষিত করে ফেলছি—এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তাই আজ সারা বিশ্বজুড়ে পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন গড়ে উঠেছে। প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল গাছপালা আর প্রাণীদের জগতে সামান্য হেরফের ঘটলেই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। দেশবিদেশের বিজ্ঞানীরা তাই এই পরিবেশ দূষণ বন্ধ করার জন্য নানা রকম চিন্তা ভাবনা করছেন। আবিষ্কার করছেন নানা যন্ত্র এবং নানান পদ্ধতি। অর্থাৎ সময়মতো সাবধানতা অবলম্বন করলে দূষণের এই বিপদ থেকে আমরা রক্ষা পাবোই। চারিদিকের এসব দূষণ আর প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতার বিরুদ্ধে আমাদের সজাগ হতে হবে। কঠোর ভাবে রুখতে হবে এসব। পরিবেশ প্রধান প্রাকৃতিক উপাদানগুলোকে রাখতে হবে দূষণবিহীন।

জলদূষণ প্রতিরোধ

জলদূষণ রোধ করতে গেলে তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে জলে যেন কোন উপায়েই দূষিত পদার্থ, নোংরা আবর্জনা, বিযাক্ত রাসায়নিক ইত্যাদি না পড়ে। দেশের নদী আর সমুদ্রে খুশিমতো কলকারখানার আবর্জনা যেন না ফেলা হয়। সমুদ্রে তৈলবাহী জাহাজ চলাচলের সময় তেল যেন কোন মতেই সাগরের জলে না মেশে তা দেখতে হবে। সাগরের জলে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, আণবিক তেজস্ক্রিয় আবর্জনা ফেলা সম্পূর্ণ বন্ধ করা দরকার। এ ব্যাপারে কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার।
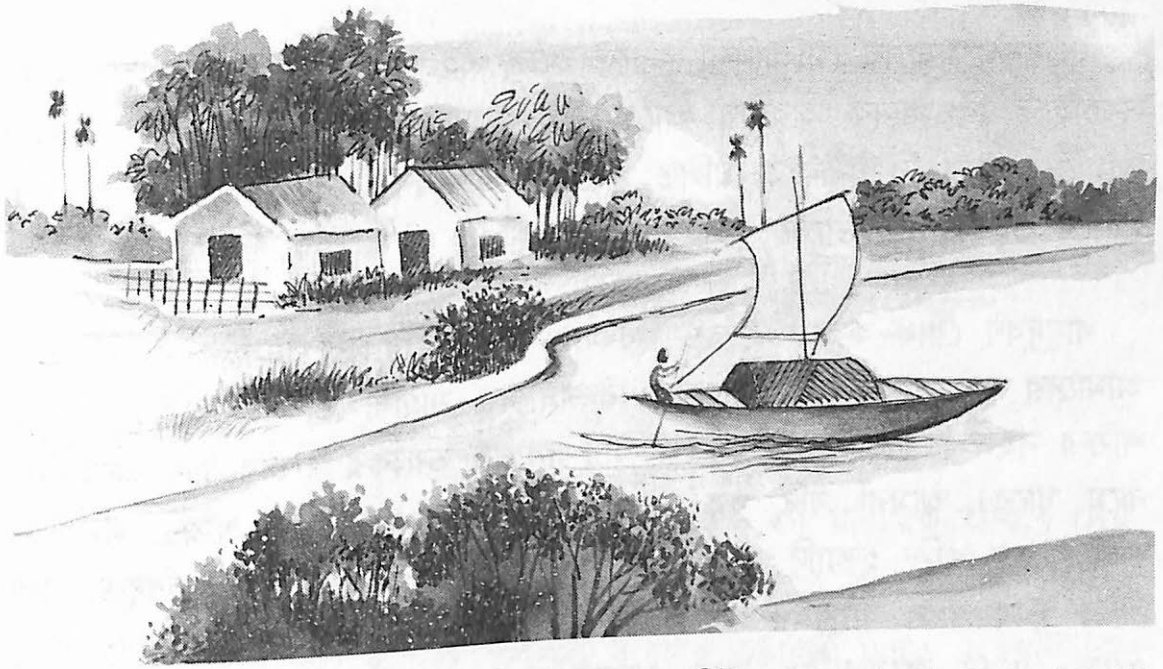
নদী আর পুকুরে যেন কোনভাবেই বিষাক্ত কীটনাশক ধোওয়া জল এসে না পড়তে পারে। নদীর স্রোত যেন কোন কিছুতে বাধা না পায়। নদী বা পুকুরে অত্যাধিক শ্যাওলা, ঝাঁঝি ইত্যাদি না গজায় তাও খেয়াল রাখতে হবে। নর্দমার বা বাথরুমের জলও যেন নদী বা পুকুরে এসে না পড়ে। কলকারখানার আবর্জনা এবং বিষাক্ত জল যেন সরাসরি নদীতে না পড়ে।

সব রকমের ক্ষতিকর আবর্জনা এবং রাসায়নিক উৎপাদনকারী কলকারখানাকে তাদের দূষিত জল নদীতে ফেলার আগে পরিশোধন করে নিতে হবে। এ ব্যাপারেও কঠোর অনুশাসন ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। এসব যদি আমরা বা তোমরা সবাই ঠিকমতো মেনে চলতে পারি তবে জল দূষণের ভয়ংকর প্রভাব আমরা অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে পারবো।

বায়ুদূষণ প্রতিরোধ

যতরকম দূষণের মোকাবিলা করতে হচ্ছে এই পৃথিবীর মানুষকে, তার মধ্যে সবচাইতে বিপজ্জনক অবস্থায় আছে এই বায়ুদূষণ। বায়ুদূষণ ঠেকাতে হবেই। আমাদের আর বিজ্ঞানীদের মিলিত প্রচেষ্টায় এ দূষণও যে আমাদের কাছে হার মানবে তা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।

বায়ুদূষণ রোধ করতে হলেও দরকার কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আর আমাদের দৃঢ় সংকল্প। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের সাহায্য ভীষণ জরুরী। প্রচলিত শক্তির সহজ বিকল্প পাওয়া গেলেই বায়ু দূষণের ভয়ংকর প্রভাব প্রায় অর্ধেকটাই কমে যাবে। আমরা যদি খুব সহজে সৌরশক্তি, জলবিদ্যুৎ শক্তি, বায়ুশক্তি, জলস্রোতের শক্তি ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি তবে, প্রচলিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ভীষণভাবে বায়ুদূষণ অনেকটাই কমে যাবে। আমরা এসব দূষণহীন শক্তি থেকে নানান প্রয়োজনীয় কাজ চালাতেও পারবো আরার বাতাসও থাকবে দূষণহীন।
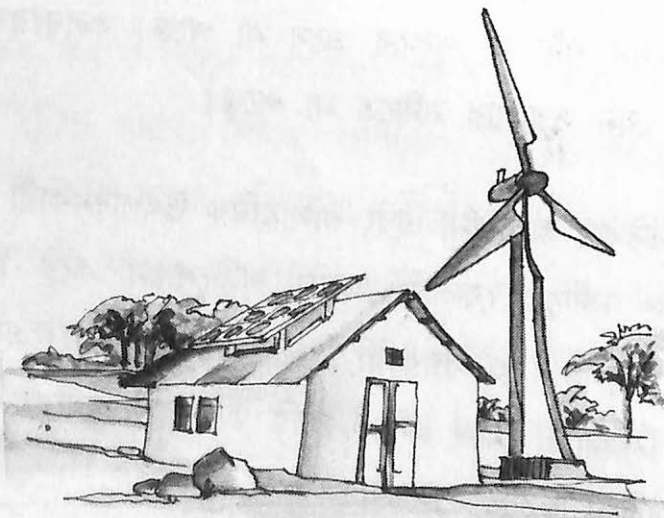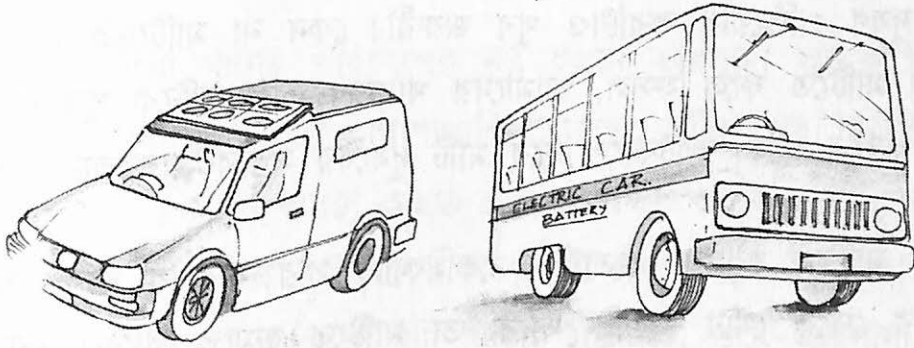
শুধু তাই নয়, যানবাহনের ধোঁয়া থেকেও এই বায়ু দূষণ মারাত্মক আকার নেয়। তাই নতুন সব মটোরগাড়ি বাস ট্রেন জাহাজ ইত্যাদি চলবে সৌরশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি বা বায়ুশক্তির সাহায্যে। প্রচলিত জ্বালানী ব্যবহার করলেও তাতে অবশ্যই দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে। গাড়ির জ্বালানী পেট্রোল পুরোপুরি সীসা মুক্ত করতে হবে। চাষীভাইদের ইচ্ছেমতো কৃষি আবর্জনা পোড়াতে দেওয়া চলবে না। কয়লা ও পেট্রোল জাতীয় জ্বালানী পোড়ানো অনেক কমিয়ে দিতে হবে। বায়ুতে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে। কলকারখানার চিমনী থেকে বেরুনো ধোঁয়া, ছাই ও অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক শোষণ ও পরিশোধনের যান্ত্রিক ব্যবস্থা রাখতে হবে। যুদ্ধের সময়ও যেন কোনভাবেই বায়ুদূষণকারী অস্ত্রের ব্যবহার না ঘটে তা দেখতে হবে।

এসব ব্যবস্থা যদি আমরা ঠিকমতো নিতে পারি তবে বায়ুদূষণ হবে নিয়ন্ত্রিত। দূষণের ভয়াবহতা কমে যাবে, আবার আমরা নির্ভয়ে ফুসফুস ভরে শ্বাস নিতে পারবো। পৃথিবী হয়ে উঠবে নির্মল-সুন্দর।

মাটি দূষণ প্রতিরোধ

মাটি দূষণ প্রতিরোধ করাটাও খুব জরুরী। কেন না মাটিতেই জন্মায় সব গাছপালা। মাটিতে ফলে ফসল, আমাদের খাবার। তাই মাটিকে খুব যত্ন নিয়ে দেখভাল করতে হবে। আটকাতে হবে মাটি দূষণের সম্ভাব্য সবরকম ব্যবস্থা।

চাষের মাটিতে আমরা অত্যাধিক কেমিক্যাল সার ব্যবহার করি। ফসলের প্রয়োজনের থেকে যেটা বাড়তি থাকে তা মাটিতে জমতে থাকে। এক সময় এভাবে মাটি বিষাক্ত বা দূষিত হয়ে পড়ে। এছাড়াও কীটনাশকের অবশিষ্ট অংশ মাটিতেই জমতে থাকে। অনেক দিন পর্যন্ত এর বিষ সক্রিয় থাকে। এগুলো আটকানো দরকার। কেমিক্যাল আর কীটনাশক যতদূর সম্ভব কম পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে।

মাটিতেই আমরা ফেলি জঞ্জাল আর হরেক রকম আবর্জনা, প্লাস্টিকের কৌটো, শিশি-বোতল, কাগজ-পত্র, ধাতুর কৌটো, পলিথিনের ব্যাগ, নাইলন, টায়ার, যানবাহনের ভাঙ্গাচোরা অংশ ইত্যাদি সবই মাটিতে জমিয়ে রাখা হয়। এগুলো কোনটাই মাটিতে মিশে যায় না। এক কিলোমিটার জায়গা নিয়ে যদি একটা পাহাড় গড়া যায় এসব জঞ্জালের তবে তা এভারেস্টের চূড়াকেও ছাড়িয়ে যাবে মাত্র এক বছরেই। এসব বন্ধ করা দরকার। আবর্জনা থেকে আলাদা আলাদা ভাবে সব জিনিসকে বার করে সেগুলোকে আবার 'রি-সাইক্‌ল' বা অন্য নতুন জিনিসে পরিণত করতে হবে। প্লাস্টিক, পলিথিন ইত্যাদির ব্যবহার কমাতে হবে। যে সব জিনিসের স্বাভাবিক বিনাশ আছে বেশী করে সেগুলোই ব্যবহার করতে হবে। নির্দিষ্ট জায়গাতেই শুধুমাত্র আবর্জনা ফেলতে হবে। আর তাহলেই মাটি দূষণ আমরা রোধ করতে পারবো।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা

দূষণরোধ করা মানেই পরিবেশের নষ্ট হওয়া ভারসাম্য অনেকটাই ফিরিয়ে দেওয়া। তবে দূষণ প্রতিরোধের পাশাপাশি আমাদের পরিবেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আর জীবসম্পদ রক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে। সংরক্ষণ করতে হবে এসব। আমরা খেয়াল রাখবো যাতে এই পরিবেশের সব প্রাণী এবং উদ্ভিদ ঠিকমতো বেঁচেবর্তে থাকে। কোন প্রাণী বা গাছপালা যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তবে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। তাই আমাদের সব গাছপালা ও প্রাণী সংরক্ষণ করতে হবে। বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে এঁদের। কঠোর আইন করে দুর্লভ প্রাণী এবং উদ্ভিদ ধ্বংস বন্ধ করতে হবেই।

এছাড়া পরিবেশের ভারসাম্য বিশেষ করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্টের জন্য দায়ী ওজোন স্তরের দুর্বলতা, পৃথিবীর সবুজ কাঁচঘর বা গ্রীন হাউসে পরিণত হওয়া বা অ্যাসিড বৃষ্টি হওয়া রোধ করতে হবে। এজন্য কলকারখানা বা উড়োজাহাজ থেকে সালফার ডাই অক্সাইড বা নাইট্রিক অক্সাইড বেরুনো অনেক কমিয়ে দিতে হবে বা বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তা আটকাতে হবে। স্প্রে করার জিনিসপত্রের উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। অরণ্য বা গাছপালার পরিমাণ অনেক বাড়াতে হবে। এভাবেই পৃথিবীতে দূষণ মুক্ত করে পরিবেশের নষ্ট হওয়া ভারসাম্যকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারবো আমরা। আমরা সবাই মিলে যা ক্ষতি করেছি তা সংশোধন করে নিতে উদ্যোগী হলে পৃথিবী সুন্দর হবেই হবে।

এ পৃথিবী আমাদের। একে বাঁচানোর দায়ও আমাদের।

পরিবেশ রক্ষায় তোমার কর্তব্য

পরিবেশের বেশ খানিকটা ক্ষতি আমরা হয়তো আমাদের অজান্তেই করে ফেলেছি। তবুও সময় আছে এ পৃথিবীকে সুন্দর আর দূষণমুক্ত করে তোলার। আমরা প্রত্যেকেই যদি পরিবেশের প্রতি সচেতন হই তবেই আমরা একাজে সফল হতে পারি। এজন্য আমাদের সবারই চাই দৃঢ় সংকল্প আর আন্তরিক প্রচেষ্টা। তুমি কি ভাবে তোমার নিজের পরিবেশের দূষণ রোধ করবে বা পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনবে তা ভেবেছো কখনও?

পরিবেশ রক্ষার এসব কাজ সব হয়তো তুমি নিজে করতে পারবে না। কিছু কাজ তুমি নিজেই সরাসরি করতে পারবে আবার কিছু কাজ তুমি নিজে করতে না পারলেও বড়দের বলতে পারবে, বোঝাতে পারবে তার গুরুত্ব।

তুমি যদি গ্রামাঞ্চলে বা শহরতলীতে থাকো তবে সেখানে তুমি সরাসরি এসব কাজ নিজেই করতে পারো। তোমার দেখাদেখি তারপর অন্যরাও তোমার কাজে সাহায্য করবে।

- তোমার এলাকার পুকুর যাতে দূষণমুক্ত থাকে সে চেষ্টা করতে হবে। এজন্য পুকুরে নোংরা নর্দমার জল ফেলা বন্ধ করতে হবে। পুকুরে কাচাকুচি বন্ধ করতে হবে। পুকুরের ধারে যাতে খাটা পায়খানা বা বাথরুম না থাকে তাও দেখতে হবে।

- গরু মোষ স্নান করানোর জন্য আলাদা পুকুর থাকবে।

- তোমার গ্রামে বা তোমার এলাকায় যদি নদী থাকে তবে সেখানেও এসব দূষণের ঘটনা যাতে না হয় তা খেয়াল রাখতে হবে।

- চাষের জমির জল যাতে কোন ভাবেই পানীয় জলের পুকুর বা নদীতে না পড়ে তাও দেখতে হবে। কেন না চাষের জমিতে ব্যবহার করা কীটনাশক আর কেমিক্যাল সার ধোওয়া জল স্বাস্থ্যের পক্ষে দারুণ ক্ষতিকর।

- নিজের বাড়িতে এবং পরিচিত লোকের বাড়িতে জ্বালানী হিসেবে গোবর গ্যাস, সৌর চুল্লী, সৌর বিদ্যুৎ, হাওয়া কল, ধোঁওয়াহীন চুলা ইত্যাদি সাধ্যমতো বসাতে হবে তাতে এলাকায় বায়ুদূষণ অনেক কমে যাবে।

- কাঠ, কয়লা, কেরোসিন ইত্যাদির ব্যবহার কমাতে হবে।

- এলাকার সব জঞ্জাল বা আবর্জনা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্ততঃ নিজের বাড়ির আবর্জনা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলবে।

- খুব প্রয়োজন ছাড়া গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে। বরং খোলা জায়গায় গাছের চারা লাগিয়ে তার যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। নিজের বাড়ির আশেপাশের খালি জমিতে সাধ্যমতো গাছ লাগাও, অন্যকেও লাগাতে বল।

- কোন আনন্দানুষ্ঠানে খুশিমতো মাইক বাজানো বন্ধ করো। অন্ততঃ নিজের বাড়িতে এরকম অনুষ্ঠানে শব্দদূষণ বন্ধ করো।

এছাড়াও কিছু কাজ তুমি সরাসরি না করতে পারলেও, খেয়াল রাখো, বড়দের বোঝাও।

- নদী বা পুকুরে যেন কলকারখানার দূষিত জল এবং আবর্জনা ফেলা বন্ধ হয়।
- এলাকার নলকূপ বা টিউবওয়েলের জল পরীক্ষা করে তাতে আর্সেনিক দূষণ আছে কিনা তা দেখার ব্যবস্থা করা। দূষণ থাকলে সেই জল ব্যবহার বন্ধ করা।
- চাষের জমিতে কৃষি আবর্জনা খুশিমতো পোড়ানো বন্ধ করা।
- চাষবাসে কেমিক্যাল সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানো।
- চাষবাসে প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করা। সম্ভব হলে জৈব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োগ করা।
- এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত নর্দমা ও পায়খানার ব্যবস্থা করা।
- চাষের এলাকায় যেখানে সেখানে অগভীর নলকূপ না বসানো।

এসব যদি ঠিকমতো মেনে চলা যায়, তবে তুমি নিজেই তোমার গ্রাম বা শহরতলীকে এক আদর্শ গ্রাম বা শহরতলীর মতো সুন্দর ও দূষণমুক্ত করে তুলতে পারবে। তুমিই পারবে তোমার পরিবেশের সঠিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে।

আর তুমি যদি শহরের বাসিন্দা হও তো তোমার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। এখানেও কিছু কিছু কাজ তুমি নিজেই সরাসরি করতে পারবে।

- পানীয় জল বা নলকূপের জল পরীক্ষা করিয়ে তাতে আর্সেনিক দূষণ আছে কিনা তা দেখতে হবে। দূষণ থাকলে বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে।
- তোমার বাড়িতে বা এলাকায় জ্বালানী হিসেবে গ্যাসের ব্যবহার বাড়াতে হবে। কয়লা, কাঠ, কেরোসিন ইত্যাদির ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলতে হবে।
- তোমার এলাকায় যদি কাছাকাছি বস্তি অঞ্চল থাকে তবে সেখানে স্বাস্থ্যসম্মত নর্দমা ও পায়খানার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবে। এজন্য নানা সমাজসেবী সংস্থার সঙ্গেও তুমি যোগাযোগ করতে পারো।
- বাড়ির এবং এলাকার জঞ্জাল বিশেষ সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হবে। জঞ্জালের মধ্যে কোন কাজের জিনিস থাকলে তা আলাদা করে বিক্রি করে দিতে হবে।
- শহরে খোলা জমি আর গাছপালার সংখ্যা খুবই কম। তাই তুমি তোমার বাড়িতে, আশেপাশে বা এলাকায় সাধ্যমতো গাছ লাগাবে। অন্যকেও উৎসাহিত করবে।
- এলাকায় যদি পুকুর থাকে তবে সেখানে জল যাতে দূষণমুক্ত থাকে সে ব্যাপারেও চেষ্টা করতে হবে।
- শব্দদূষণ শহরে অনেক বেশী। তবুও তোমার বাড়ি বা আশেপাশে কেউ যাতে অকারণে বেশী জোরে মাইক না বাজায় বা রেডিও, টিভি না শোনে তাও দেখতে হবে।

তাছাড়াও অনেক ব্যাপারে সরাসরি তুমি নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলেও বড়দের জানাতে বা বোঝাতে পারবে, এবং খেয়াল রাখতে পারবে এসব ক্ষতির দিকে।

- গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহনে যেন সীসামুক্ত পেট্রোলই শুধু ব্যবহার করা হয়।
- গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহনে যেন ধোঁয়া পরিশোধন যন্ত্র লাগানো হয়।
- এসব যানবাহনে যেন জোরালো হর্ণ বা বিশ্রী আওয়াজ তৈরি না হয়।
- সাধ্যমতো সৌরশক্তি চালিত বা ব্যাটারী চালিত গাড়ির ব্যবহার বাড়াতে হবে।
- কলকারখানা থেকে এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বের হওয়া ধোঁওয়া, রাসায়নিক গ্যাস ও ছাই-এর শোষণ বা পরিশোধন ব্যবস্থা থাকা অবশ্যই দরকার।
- কলকারখানা থেকে বেরুনো দূষিত জল, আবর্জনা বা বিষাক্ত রাসায়নিক নদীতে ফেলা বন্ধ করতে হবে। কলকারখানায় দূষিত জল পরিশোধনের ব্যবস্থা রাখা আবশ্যিক করতে হবে।
- জঞ্জাল থেকে কোন কাজের জিনিস তৈরি করা যায় কিনা তাও দেখতে হবে।
- এলাকার সব পুকুর ও জলা বুজিয়ে বহুতল বাড়ি তৈরির এই ভয়ংকর প্রতিযোগিতা বন্ধ করা খুবই জরুরী।
- রাস্তার ও গৃহপালিত পশুদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা দরকার।
- এলাকায় জমে থাকা নোংরা জল ইত্যাদি মশার জন্ম দেয় সেটাও বন্ধ করা দরকার।

এভাবেই তোমরা সবাই মিলে বাঁচাতে পারবে তোমাদের পরিবেশ। তোমাদের সকলের দায়িত্ববোধ আর আন্তরিকতা থাকলে এ পৃথিবী দূষণমুক্ত হবেই—এ বিশ্বাস আমাদের সকলেরই।

তুমিই পারবে তোমার পরিবেশকে দূষণমুক্ত আর নির্মল রাখতে। তোমার এলাকার কোথাও যদি পরিবেশের দূষণ বা অন্য কোন ক্ষতি চলতে থাকে তবে তুমি তা প্রতিরোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। নিজে একা না পারলেও হাল ছাড়বেনা। বন্ধুদের বলবে, বড়দের বলবে। দেখবে একটা না একটা উপায় বার হবেই।

তুমি, আমি আর অন্য সবাই মিলে যদি পরিবেশের ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব নিতে পারি, আন্তরিকভাবে যদি পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি—তবেই আমরা সফল হবো। মনে রাখতে হবে যে পরিবেশের ভারসাম্য ফিরে আসলে আমাদের প্রত্যেকেরই তাতে মঙ্গল। সবাইকে বোঝাতে হবে কথাটা। আর তাইতো সবাই যদি আন্তরিক ভাবে নিজের নিজের এলাকার পরিবেশের উন্নতি ঘটাতে সচেষ্ট হয়—তবেই আমাদের গোটা দেশের এমন কি সারা বিশ্বের পরিবেশ সুন্দর হয়ে উঠবে।

ভবিষ্যতের মানুষের জন্য তুমি রেখে যেতে পারবে সুস্থ-সুন্দর এক পরিবেশ। এসো আমরা এখনই এই পৃথিবীকে সুন্দরতর করার সেই মহান শপথ নিই।

"এ পৃথিবী আমাদের। একে বাসযোগ্য করে

তোলার দায়িত্ব আমাদেরই।"